সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ-আ-ক-খ

আ. ইয়ের্মাকোভা, ভ. রাতনিকভ

শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম

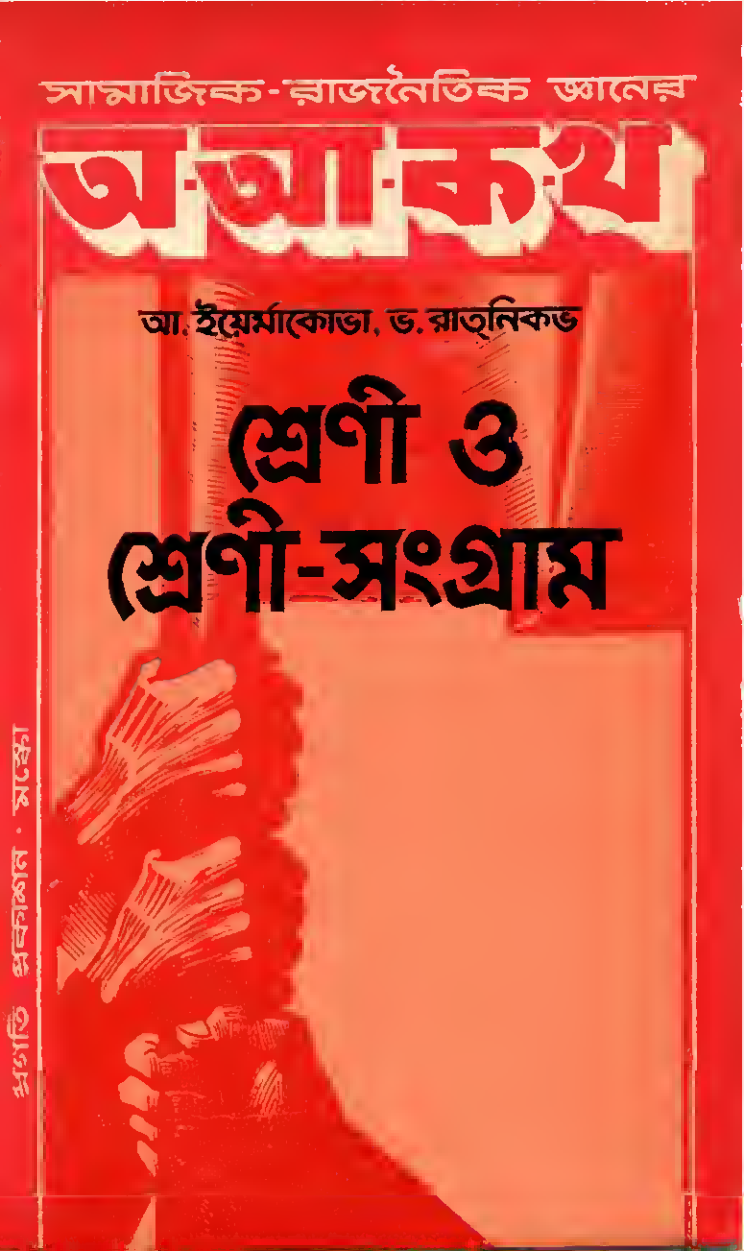

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

সামাজিকে-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ

আ. ইয়েমাকোভা, ভ. রাত্‌নিকভ

শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ গ্রন্থমালার সম্পাদকমণ্ডলী: ফ. ভোলকভ (প্রধান সম্পাদক), ইয়ে. গুবস্কি (প্রধান সহসম্পাদক), ফ. বুর্লাৎস্কি, ভ. জোতভ, ভ. ক্রাপিভিন, ইউ. পোপভ, ভ. সোবলেভ, ফ. ইউর্লভ

АБС СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

А. Ермакова, В. Ратников

ЧТО ТАКОЕ КЛАССЫ
И КЛАССОВАЯ БОРЬБА?

на языке бенгали

ABC OF SOCIAL AND POLITICAL KNOWLEDGE

A. YERMAKOVA, V. RATNIKOV

WHAT ARE CLASSES AND THE CLASS STRUGGLE?

in Bengali

© Progress Publishers 1986
© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৮৮

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Б $\frac{0302030000-528}{014(01)-88}$ 297—88

ISBN 5-01-000816-5

সূচি

ভূমিকা ৫

প্রথম অধ্যায়। সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সমাজের কাঠামো . . ৯

দ্বিতীয় অধ্যায়। সামাজিক শ্রেণী কী জিনিস? ২০

তৃতীয় অধ্যায়। শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ . . ৩৫

চতুর্থ অধ্যায়। বর্তমান সমাজের শ্রেণী বিন্যাস ৫৭

পঞ্চম অধ্যায়। শ্রেণী সংগ্রাম — বৈরগর্ভ ব্যবস্থার বিকাশে চালিকা শক্তি ৯৭

ষষ্ঠ অধ্যায়। শ্রেণী সংগ্রাম বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায় — সামাজিক বিপ্লব . . ১৩৬

সপ্তম অধ্যায়। ইতিহাসের বর্তমান পর্যায়ে শ্রেণী সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য . ১৭৪

অষ্টম অধ্যায়। শ্রেণীহীন সমাজের পথে . ২১৯

নবম অধ্যায়। জাতিতে জাতিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং শ্রেণী সংগ্রাম ২২৬

ব্যবহৃত পরিভাষার অর্থ ২৩৯

ভূমিকা

লোকেরা নিজেরাই নিজেদের ইতিহাস গড়ে। ঐতিহাসিক বিকাশের কারণ নিয়ে যারা ভাবে, বিশ শতকে তাদের অধিকাংশের কাছে এই সত্যটা প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে এই কথাটা যে ঠিক লোকেদের ক্রিয়াকলাপের ওপরেই নির্ভর করছে মানবজাতির ভবিষ্যৎ। তারাই ফলাচ্ছে নতুন জাতের উচ্চফলনী শস্য, পালছে নতুন জাতের গরু-ভেড়া, গড়ে তুলছে নতুন টেকনিকাল পদ্ধতি, এমনসব উদ্‌ভাবন করছে যাতে সম্ভব হচ্ছে নতুন নতুন শক্তি আয়ত্ত করা, মহাকাশে যাওয়া। বিশ শতক হল মহান সব সামাজিক বিপ্লব আর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যুগ, যাতে সমাজসম্পর্ক পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রামে এসে পড়ছে কোটি কোটি লোক।

কিন্তু লোকেদের আচরণ নির্ধারিত হচ্ছে কিসে? সম্ভবত বড়ো বড়ো ঐতিহাসিক কর্মকর্তা, নায়কদের ইচ্ছায়, ভেবে ভেবে সংরচিত মহতী সব ভাবনায়? একসময় লোকে তা-ই ভাবত: শাসক প্রাজ্ঞ আর আলোকপ্রাপ্ত হলে লোকেও সুখী হবে। কিন্তু ইতিহাসের বাস্তব গতিতে তা সমর্থিত হয় নি। জীবনের সামাজিক পুনর্গঠনের আন্দোলনে জনপুঞ্জকে টেনে আনতে হলে প্রয়োজন সংগ্রামটা যেন চলে তাদের স্বার্থে। সমুজ্জ্বল কোনো ভাবকল্পই লোকেদের সংগ্রামে টেনে আনবে না, যদি সেটা তাদের স্বার্থ নিয়ে না হয়।

কিন্তু আমরা জানি যে প্রতিটি মানুষই যাপন করে তার নিজস্ব জীবন, থাকে তার নিজস্ব স্বার্থ, কাজে নামে নিজেরই কোনো একটা বিবেচনায়, প্রত্যেকেই অনুসরণ করে নিজস্ব লক্ষ্য। কিন্তু লোকেরা যা অনুসরণ করতে চায়, প্রায়ই তারা পরস্পরবিরোধী, সংঘাতে আসে। মানবিক ক্রিয়াকলাপের সংঘাতেই নির্দিষ্ট হয় ইতিহাসের গতি। সে গতি কি রূপ নেয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে, তা কি অজ্ঞেয়? নাকি লোকেদের ক্রিয়াকলাপে কিছু একটা নিয়মবদ্ধতা আছে? বিভিন্ন দার্শনিক তন্ত্র এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়েছে। সমাজ বিষয়ে মার্কসীয় বিজ্ঞান মনে করে যে লোকেদের ঐতিহাসিক ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয় সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম অনুসারে, তাদের চরিত্র অবজেকটিভ অর্থাৎ লোকেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা চেতনার ওপর তা নির্ভর করে না। কিন্তু মানবিক ক্রিয়াকলাপের এই নিয়মগুলি

জানা সম্ভব এবং সামাজিক সম্পর্কের পুনর্গঠনে তা সচেতনভাবে ব্যবহার করা যায়। সেটা কিভাবে সম্ভব?

প্রতিটি মানুষ নিজের বিশেষ লক্ষ্য অনুসরণ করলেও সমাজের বড়ো বড়ো এক-এক দলের স্বার্থ অনেক দিক দিয়ে একই রকম। এই সমাপতনের কারণ কোনো একটা গ্রুপের লোকেদের অবস্থান সমাজে একইরকম। যেমন, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ স্বার্থের কারণ নিজস্ব উৎপাদনের উপায় তাদের কারো নেই, এবং জীবন নির্বাহের জন্য তাদের অন্যের হয়ে খাটতে হয় আর তার জন্যে পায় মজুরি (যেখানে পুঁজিপতিরা পায় মুনাফা)। কৃষক বা কারুজীবীদের সাধারণ স্বার্থের কারণও সামাজিক সম্পর্কের ব্যবস্থায় একই রকম অবস্থান। সামাজিক সম্পর্কের ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্থানধারী লোকেদের এই ধরনের বড়ো বড়ো গ্রুপকেই বলা হয় শ্রেণী। সাধারণ শ্রেণী স্বার্থের জন্য সংগ্রামেই নির্ধারিত হয় বিকাশের দীর্ঘকাল ধরে মানবিক সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশ। সেইকারণে মার্কসবাদী তত্ত্ব শ্রেণী সংগ্রামকেই মনে করে ইতিহাসের চালিকা শক্তি এবং খুবই মনোযোগ অর্পণ করে তার নিয়মগুলির অধ্যয়নে।

কেন ইতিহাসের নির্দিষ্ট একটা পর্যায়ে বিপরীত স্বার্থ নিয়ে বিভিন্ন গ্রুপে, শ্রেণীতে সমাজের বিভাগ দেখা দেয়? এইসব গ্রুপের অস্তিত্ব কিভাবে লোকেদের উৎপাদনী সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত? শ্রেণী সংগ্রাম কী কী রূপ নেয় আর কিভাবে তা ইতিহাসের গতিকে প্রভাবিত করে? মানবিক বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে

শ্রেণী সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য কী এবং কিভাবে তা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট? শ্রেণীহীন সমাজের উদয় কোন পথে? শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম বিষয়ে মার্কসীয় মতবাদের কেন্দ্রে রয়েছে এইসব প্রশ্ন। এটা হল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মার্কসবাদী তত্ত্বের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিভাগ, বর্তমান জগতে সামাজিক জীবনের জটিল সব ঘটনা বোঝার চাবিকাঠি পাওয়া যাবে তাতে।

প্রথম অধ্যায়

সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সমাজের কাঠামো

শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম কী জিনিস তা জানতে হলে প্রথমে জানা দরকার সমাজ বলতে কী বোঝায়। এটা জরুরি কারণ খোদ শ্রেণী, তাদের সংগ্রামটা থাকে এবং চলে সমাজের মধ্যে আর সমাজের কাঠামো দিয়েই তা নির্ধারিত।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ থেকে দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন থাকলে সে ক্রমশ তার মানবিক ধর্ম হারাতে থাকে।

বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে বিরল কিছু ঘটনার কথা আছে যখন মানবশিশু কদাচ মানুষের সংস্পর্শে না এসে জন্তুদের মধ্যে বেড়ে উঠেছে। কিরকম এই শিশুরা? বাহ্যিক চেহারাটা ছাড়া তাদের মধ্যে মানবিক কিছুই থাকে নি। কথা বলতে পারত না তারা, কাজে লাগার মতো হাতিয়ার

চালাতে পারত না, চারিপাশের জগৎ সম্পর্কে নিতান্ত সাধারণ ধারণাও ছিল না। তাদের ছিল কেবল সুদূর পূর্বপুরুষ থেকে কতকগুলি স্বতঃপ্রবৃত্তির ভিত্তিতে নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় চারিপাশের প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে চলার খানিকটা ক্ষমতা। এই ধরনের ঘটনায় জাজ্বল্যমানরূপে প্রমাণিত হয় যে মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে কেবল লোকেদের মধ্যে।

সমাজে থাকে অতি বিভিন্ন সব সম্পর্ক: আত্মীয়তাবন্ধন, তথা রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সম্পর্ক। প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনো ভাবে বহুবিধ এইসব সামাজিক সম্পর্কের অন্তর্গত। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক সক্রিয় থাকে বিভিন্ন যেসব সামাজিক গ্রুপ নিয়ে সমাজ গঠিত তাদের মাধ্যমে। পরিবার, প্রতিবেশীবর্গ, গ্রামসম্প্রদায়, সমবৃত্তিধারী, গ্রাম, নগর, সামাজিক শ্রেণী — এ সবই হল লোকেদের তেমন গ্রুপ ও সামাজিক গঠনের দৃষ্টান্ত যার মাধ্যমে মানুষ সামাজিক সম্পর্ক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়।

সমাজ হল কেবল মানুষেরই বৈশিষ্ট্যসূচক জীবননির্বাহক ক্রিয়াকলাপের রূপ, এ হল ব্যষ্টি, সামাজিক গ্রুপ আর সেইসব সামাজিক সম্পর্কের সমষ্টি যা তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে এবং নানা ধরনের সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। পক্ষান্তরে, মানুষের মতোই তা প্রকৃতির অংশ, তার বিকাশের প্রলম্বন। তাই সমাজের উদ্ভব প্রকৃতিজগতের অভ্যন্তরীণ বিকাশের

নিয়মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু অন্যদিকে সমাজ এমন কতকগুলি উপাদান ও প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত যা পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিতে নেই। সমাজে সক্রিয় থাকে অচেতন শক্তি নয়, মানুষেরা, যারা চেতনা ও ইচ্ছার অধিকারী। জীবনধারণ ও নিজের পুনরুৎপাদন চালিয়ে যাবার জন্য তাদের খেতে পরতে হবে, বানাতে হবে বাসা, মেটাতে হবে নিজের একান্ত জরুরি চাহিদা। আর সেজন্য খাটতে হবে তাদের।

শ্রমই হল সেই জিনিস যা মানুষ ও সমাজের উদ্ভবে নির্ধারক ভূমিকা নিয়েছে। গোড়া থেকেই মানুষের শ্রম তার প্রয়োজন মেটাবার মতো কোনো না কোনো সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত। জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক উপায় সংগ্রহ করে এবং তাতে প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে গিয়ে মানুষ শ্রমপ্রক্রিয়ায় নিজেকেও পরিবর্তিত করে। শ্রম হল জীবজগৎ থেকে মানুষকে তফাৎ করার উপায়, মানবিক বিকাশের ভিত্তি।

প্রকৃতিদত্ত সামগ্রীর সরল যে পরিভোগ মাঝে মাঝে পশুদের মধ্যেও দেখা যায়, তা থেকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা চলে আসে শ্রমের হাতিয়ার প্রস্তুতিতে। মানুষের পূর্বপুরুষদের দেহযন্ত্র কেবল পরিবেশের সঙ্গে নয়, শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেও অভিযোজিত হতে থাকে। শ্রমক্রিয়ার সঙ্গে দেহসত্তার দীর্ঘকালীন অভিযোজনের মধ্যে দিয়ে মানবরূপী আদিজীব আয়ত্ত করল সিধে চলন, সামনের দু'পা আর পেছনের দু'পার কাজ ভাগ হয়ে গেল, বিকশিত হল হাত আর মস্তিষ্ক। লোকেদের একত্র ক্রিয়াকলাপ চলায় সাহায্য

হল লোকেদের কথা ফুটতে, ভাষা বিকাশে, যা হল আদান-প্রদানের, শ্রমমূলক ও সামাজিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যম।

মানুষ আর তার হাতিয়ারের রূপলাভ ও উন্নত হয়ে ওঠার পর্যায়গুলি একই সঙ্গে আদি চেহারায় মানবিক সমাজের রূপলাভেরও পর্যায়। সমাজের বাইরে মানুষ দেখা দিতে পারত না। আবার সমাজও দেখা দিতে পারত না মানুষের আগে। ব্যষ্টিদের মধ্যে যোগাযোগের সামাজিক রূপ বিকশিত হতে থাকল কেবল যে পরিমাণে আমাদের প্রাক্‌প্রজাতি হয়ে উঠতে থাকল মানুষ।

রূপ যাই হোক, ঐতিহাসিক বিকাশের যে পর্যায়েই তা থাকুক, উৎপাদন ছাড়া কোনো সমাজের অস্তিত্ব ও বিকাশ সম্ভব নয়। বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদন সর্বদাই আবির্ভূত ইতিহাস-নির্দিষ্ট একটা **উৎপাদনের প্রণালী** বা ধরনে, যা হল তার অচ্ছেদ্য দুই দিকের ঐক্য: **উৎপাদনী শক্তি** আর **উৎপাদনী সম্পর্ক**। উৎপাদনী শক্তিতে প্রকাশ পায় প্রাকৃতিক বস্তু ও শক্তির সঙ্গে লোকেদের সম্পর্ক, যাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে লোকে পায় তাদের বৈষয়িক সম্পদ। উৎপাদনী সম্পর্ক হল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় লোকেদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক।

উৎপাদনী শক্তির সাহায্যে সমাজ প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে, তাকে বদলায়। এক্ষেত্রে প্রকৃতি হল **শ্রমের** সাধারণ **বস্তু**। শ্রমের বস্তু হল প্রকৃতির সেই অংশটা যা উৎপাদন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। উৎপাদনে শ্রমের বস্তু নানারকম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পরিণত

হয় লোকেদের চাহিদা মেটাবার মতো বস্তুতে। এটা চলে **শ্রমের উপায়ের** সাহায্যে। শ্রমের উপায় হল সেই জিনিস বা সামগ্রী সমাহার যা থাকে মানুষ আর শ্রমের বস্তুর মাঝখানে এবং যার সাহায্যে মানুষ শ্রমের বস্তুকে প্রভাবিত করে। যেমন, কৃষকের নিড়ানি যন্ত্রটা শ্রমের সেই উপায় যা দিয়ে সে জমি চষছে। শ্রমের বস্তু আর শ্রমের উপায় একত্রে হল **উৎপাদনের উপায়।**

শ্রমের উপায় খুবই বহুবিধ, যুগে যুগে তা বদলায়। শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন, নানারকম সহায়ক উপায়াদি, যা প্রয়োজন পরিবহণ, দ্রব্য রক্ষণ এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে। শ্রমের উপায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল শ্রমের হাতিয়ার। তা হতে পারে নানা ধরনের এবং নানা কাজের জন্যে: নিড়ানি, কুড়ুল, হাতুড়ি, লেদ মেসিন, যন্ত্র ইত্যাদি।

কিন্তু শ্রমের উপায় শ্রমের বস্তুকে পুনর্গঠিত করার মতো সক্রিয় শক্তিতে পরিণত হয় কেবল মানুষের সাহচর্যে। মানুষ, মেহনতি জনগণ যে উৎপাদনী শক্তি, সেটা তাদের তেমন জ্ঞান-অভিজ্ঞতা, অভ্যাস আছে বলে, যা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন।

তাই, **সামাজিক উৎপাদনী শক্তি হল সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট উৎপাদনী উপায়, সর্বাগ্রে শ্রমের হাতিয়ার, সেইসঙ্গে লোকেরা যারা সেইসব হাতিয়ার চালাচ্ছে এবং বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন করছে।** উৎপাদনী শক্তি হল সমাজবিকাশের ভিত্তি, **উৎপাদনের প্রণালীর** প্রধান দিক। উৎপাদনী শক্তির বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ের উপযোগী এক-একটা উৎপাদনী সম্পর্ক থাকে।

বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন করতে গিয়ে লোকে শুধু প্রকৃতির ওপর নয়, নিজেদের মধ্যেও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটায়। তাই **উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তাদের নিজেদের মধ্যে দেখা দেয় নির্দিষ্ট কতকগুলি সম্পর্ক, যাকে বলা হয় উৎপাদনী সম্পর্ক।** এই সম্পর্কগুলি হল সর্ববিধ বৈষয়িক উৎপাদনের অচ্ছেদ্য দিক। উৎপাদনের মধ্যে থাকে উৎপাদনী শক্তি আর উৎপাদনী সম্পর্ক, তাতে প্রকাশ পায় এ দুয়ের ঐক্য। উৎপাদনী সম্পর্ক গড়ে ওঠে লোকেদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভর না করে। সর্বাগ্রে সেটা নির্ধারিত হয় উৎপাদনী শক্তির বিকাশের মাত্রার ওপর।

উৎপাদনী সম্পর্কের সমগ্র সমষ্টির মধ্যে প্রধান, নির্ধারক হল উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে লোকেদের সম্পর্ক, সুতরাং **মালিকানা সম্পর্ক**। উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানা হতে পারে মূলত দুই ধরনের: সামাজিক অথবা ব্যক্তিগত। মালিকানার প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে উৎপাদনে বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপের অবস্থা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তাদের সম্পর্ক। উৎপাদনের উপায় যদি এক-একজন ব্যক্তি, সামাজিক গ্রুপের অধিকারে থাকে, যারা তা ব্যবহার করছে মেহনতিদের শোষণের উদ্দেশ্যে, তাহলে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক। উৎপাদনের উপায় যখন থাকে গোটা সমাজের মালিকানায়, যখন তা জনগণের সম্পত্তি, তখন প্রতিষ্ঠিত হয় পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক। যে সমাজে উৎপাদনের উপায় (ভূমি, কলকারখানা, খনি প্রভৃতি) জনগণের সম্পত্তি,

সেখানে উৎপাদন চলে সমাজের সমস্ত সভ্যের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটাবার জন্য। যেখানে উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপায় এক-একজন ব্যক্তির হাতে অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানার পরিস্থিতিতে, সেখানে উৎপাদন চলে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির এক-একটা গ্রুপের স্বার্থে।

উৎপাদনী শক্তি আর উৎপাদনী সম্পর্ক হল সামাজিক উৎপাদনের দুই দিক। তাদের মধ্যে চলে অবিরাম ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া, উৎপাদনী শক্তির চরিত্র ও মানের সঙ্গে উৎপাদনী সম্পর্কের উপযোগিতার নিয়ম অনুসারে সেটা কার্যকৃত হয়। এ নিয়ম কার্ল মার্কসের আবিষ্কার।

এ নিয়মের সারার্থ হল এই যে সমাজে নতুন উৎপাদনী শক্তি দেখা দিলে অচিরে বা বিলম্বে উৎপাদনী সম্পর্ক বদলায়। উৎপাদনী সম্পর্ক দানা বাঁধে উৎপাদনী শক্তির প্রভাবে। কিন্তু সমাজের অন্যান্য সম্পর্ক — রাজনৈতিক, নৈতিক, পারিবারিক ইত্যাদির মধ্যে উৎপাদনী সম্পর্কই প্রধান এবং নির্ধারক। তাই উৎপাদনী সম্পর্কের পরিবর্তনে বদলিয়ে যায় অন্যান্য ধরনের সমস্ত সামাজিক সম্পর্কও। আর সেইসঙ্গে বদলে যায় সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানও, গোটা সমাজটাই।

উৎপাদনী সম্পর্ক গড়ে ওঠে উৎপাদনী শক্তির বিকাশের ভিত্তিতে, কিন্তু সেটা আবার উৎপাদনী শক্তির বিকাশকে, তার বৃদ্ধির গতিবেগ ও চরিত্রকেও সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করে। উৎপাদনী সম্পর্ক যদি উৎপাদনী শক্তির চরিত্র ও বিকাশমাত্রার উপযোগী হয়,

তাহলে ত্বরান্বিত হয় উৎপাদনী শক্তির বিকাশ, সে শক্তির জন্য তা পরিসর উন্মুক্ত করে এবং তাতে করে গোটা সমাজবিকাশের ইঞ্জিন হিশেবে তা এগিয়ে আসে। কিন্তু উৎপাদনী সম্পর্ক যদি উৎপাদনী শক্তির বিকাশমাত্রা আর চরিত্রের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, তখন তা উৎপাদনী শক্তির বিকাশে সহায়ক তো নয়ই, বরং তার প্রতিবন্ধক, নিগড়। সেক্ষেত্রে উৎপাদনের একটা প্রণালী থেকে অন্য প্রণালীতে, একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অন্যটায় পরিবর্তন আবশ্যক।

সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল ইতিহাসের দিক থেকে নির্দিষ্ট এমন একটা সমাজ যাতে প্রকাশ পাচ্ছে তার বিকাশের বিশেষ পর্যায়, তার বৈষয়িক ও আত্মিক জীবনের সবদিক নিয়ে যা তার পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। প্রতিটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নির্ধারক দিক হল উপযোগী উৎপাদনী সম্পর্ক সমেত উৎপাদনের এমন প্রণালী যা ইতিহাসের দিক থেকে সুনির্দিষ্ট। তাই বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্য নির্ভর করে সর্বাগ্রে সমাজে বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের ধরন, উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপায়ের ওপর মালিকানার রূপের ওপর।

সমাজের ইতিহাস হল সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ ও পালা বদলের ইতিহাস। মানব ইতিহাসের সাধারণীকরণের ভিত্তিতে মার্কসবাদীরা পাঁচটি মূলগত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পৃথক করেছে: আদিম, দাসতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক,

কমিউনিস্ট। আদিম ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে মানুষের রূপলাভ ঘটতে থাকে, গড়ে ওঠে সমাজের আরো বিকাশের পূর্বশর্ত। আদিম ব্যবস্থার স্থলে এল বৈরীশ্রেণীবিভক্ত সমাজ: দাসতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক। তাদের বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক অসাম্য, মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ, শ্রেণীগুলির মধ্যে সংগ্রাম। পুঁজিতন্ত্রের স্থান নেয় এমন সমাজব্যবস্থা যা বৈরগর্ভ নয় — কমিউনিস্ট ব্যবস্থা, যা লোকেদের সমতা, ভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক সাহায্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

উক্ত সমাজব্যবস্থাগুলির ধারাবাহিক পালা বদল হল মানবিক প্রগতির রাজপথ। সেইসঙ্গে পৃথক এক-একটা দেশের ও জাতির বিকাশে প্রচুর পার্থক্য থাকে: তাদের বিকাশের গতিবেগ হয় বিভিন্ন, প্রত্যেকটা জাতিই যে সবকটা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যায় এমন নয়। বিভিন্ন উত্তরণমূলক রূপও দেখা যায় ইতিহাসে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতবাদই হল সমাজ বিষয়ক বিজ্ঞানের মূলকথা। 'সাধারণভাবে সমাজ', 'সাধারণ প্রগতি' ইত্যাদি অবৈজ্ঞানিক, বিমূর্ত ধ্যানধারণা পুরোপুরি বর্জিত হয়েছে তাতে। ঐতিহাসিক বিকাশের পর্যায় বিভাগের ভিত্তি হিশেবে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধরায় সমাজের কাঠামোর কথা বলা সম্ভব হচ্ছে।

সমাজের কাঠামো হল সামাজিক গ্রুপ ও তাদের মধ্যে সম্পর্কের যোগফল। সমাজের কাঠামোর উপাদান হতে পারে শ্রেণী, সামাজিক স্তর, উপস্তর, জাত,

সম্প্রদায়, বৃত্তিমূলক গ্রুপ, নরকৌলিক গোষ্ঠী (জাতি, জাতিসত্তা, উপজাতি), বয়ো বিভাগ (যুবা, বৃদ্ধ) ইত্যাদি। সমাজে সবচেয়ে গুরুত্ব ধরে তার শ্রেণী গঠন। প্রতিটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার থাকে নিজস্ব বিশেষ সমাজের কাঠামো, যা দেখা দেয় উৎপাদনের প্রাধান্যকারী ধরন বা প্রণালী থেকে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ থেকে দেখা যায় যে সমাজের ইতিহাসে আছে দুই ধরনের সমাজের কাঠামো — **শ্রেণীহীন** ও **শ্রেণীবিভক্ত**। সমাজের শ্রেণী গঠন হতে পারে **বৈরমূলক** অথবা **অবৈরমূলক**।

সমাজের কাঠামোয় বৈরী শ্রেণী থেকেছে দাসতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। তাদের ভিত্তি বৈরী শ্রেণী, অর্থাৎ এমন শ্রেণী যাদের মধ্যে থাকে আপোসহীন বিরোধ, অনবরত শ্রেণী সংগ্রাম চলে। এই সংগ্রাম (দাস আর দাসমালিক, ভূমিদাস আর সামন্ত, প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়ার মধ্যে) চলতে থাকে বৈরীশ্রেণীবিভক্ত সমাজের গোটা বিকাশ ধরে।

বৈরহীন শ্রেণী সমাজ হল সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। এখানে শ্রেণী থাকলেও শ্রমের হাতিয়ার ও উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে থাকে মিত্রতার সম্পর্ক। সমাজতান্ত্রিক সমাজ যত বিকশিত হয় এবং কমিউনিজম নির্মাণের দিকে যত এগুনো যায়, ততই শ্রেণী পার্থক্য মুছে যেতে থাকে। তাই ধরে নেওয়া যায় যে সমাজের শ্রেণীহীন কাঠামো রূপলাভ করবে মূলত এবং প্রধানত সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিধির মধ্যেই।

আদিম সমাজও ছিল শ্রেণীহীন, কিন্তু সেটা শ্রেণী উদ্ভবের আগে। শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজে কিন্তু শ্রেণীর বিলোপ ঘটে। এ সমাজ গড়ে ওঠে উৎপাদনী শক্তির উচ্চ মাত্রা, সামাজিক মালিকানা আর ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের ভিত্তিতে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামাজিক শ্রেণী কী জিনিস?

১। শ্রেণী

সমাজে থাকে লোকেদের নানাবিধ বহু গ্রুপ। নানান লক্ষণে তাদের ভাগ করা যায়। যেমন, গায়ের রং বা অঙ্গের দৈর্ঘ্য, লিঙ্গ বা বয়স, ভাষা বা বাসাঞ্চল, পার্টিভুক্তি বা ধর্ম, আয় বা শিক্ষার মান, জীবনযাত্রার ধরন বা ঐতিহ্য অনুসারে। লোকেদের এই ধরনের বিভাগ নিশ্চয় ন্যায্য এবং আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাজারে জুতো ছাড়তে হলে জানা দরকার কোন কোন গ্রুপের পায়ের মাপে কত লোক, জনসংখ্যাবিদদের জানা দরকার সমাজে নারী পুরুষের সংখ্যা, তাদের বয়স, নরকুলবিদদের প্রয়োজন জীবনযাত্রার ধরন আর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে লোকেদের ভাগ করা।

কিন্তু সমাজে থাকে বিশেষ ধরনের বড়ো বড়ো

এক-এক দল লোক, সমাজ বিকাশের নিয়মগুলি বোঝা ও ব্যাখ্যা করার জন্য যাদের অনুধাবন আবশ্যক। এই গ্রুপটাকে বলা হয় **সামাজিক শ্রেণী**। তা দেখা দিয়েছে সামাজিক শ্রম বিভাগ আর সেইসঙ্গে উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা উদ্ভবের ফলে। ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা দেওয়ায় সমাজ ভাগ হয়ে যায় ধনী আর দরিদ্রে, শোষক আর শোষিতে। উৎপাদনের হাতিয়ার আর উপায়ের (ভারবাহী পশু, কলকারখানা, খনি, রেলপথ ইত্যাদির) অধিকারীদের পক্ষে সম্ভব হয় নিজেদের জন্যে অন্য একদল লোককে খাটানো, যারা ব্যক্তিমালিকদের কাছে মজুরি নিয়ে শ্রমশক্তি বিক্রয়ে বাধ্য হয়। এতে উৎপাদনী উপায়ের মালিকেরা তাদের জন্য যারা খাটছে তাদের শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে। এক দল লোক শোষিত হয় অন্য দলের দ্বারা। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় দলটা সংখ্যাল্প, প্রথমটা অধিকাংশ। চলে অল্পাংশ দ্বারা অধিকাংশের শোষণ। এই যে একদল লোক শোষক, উৎপীড়ক, অন্যদল শোষিত, উৎপীড়িত, তাদের বলা হয় বৈরী শ্রেণী, কারণ তাদের স্বার্থ আপোসহীন।

শ্রেণী বিকাশের অভিজ্ঞতা বিচার করে শ্রেণীর মর্মার্থ, তার উদ্ভবের কারণ, বিলুপ্তির পথ নিয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক মীমাংসা দেয় মার্কসীয় তত্ত্ব। শ্রেণীর অস্তিত্বকে মার্কস সংশ্লিষ্ট করেছেন সামাজিক উৎপাদন বিকাশের সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায়গুলির সঙ্গে। তাঁর পূর্ববর্তী, বুর্জোয়া বিজ্ঞানীরা সেটা করেন নি। তাঁদের কাছে শ্রেণী সর্বদা ছিল, ইতিহাসের সঙ্গে তার

কোনো সম্পর্ক নেই। ইতিহাসের দিক থেকে শ্রেণী সমাজের উত্তরণমূলক চরিত্র প্রতিপাদিত করেন মার্কস। তিনি দেখান কী কারণে এবং কখন শ্রেণী সমাজকে বিলুপ্ত হতে হবে, তার জায়গায় আসতে হবে শ্রেণীহীন সমাজ। তিনি দেখান যে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ হল মানবজাতির ইতিহাসে বৈরী শ্রেণী নিয়ে গঠিত শেষ সমাজ। আর শ্রেণীহীন সমাজের পথ গেছে সমস্ত ধরনের পীড়নের বিরুদ্ধে, সমস্ত মেহনতির স্বার্থরক্ষক নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে মার্কস ও এঙ্গেলস আবিষ্কার করেন সেই প্রধান শক্তিকে যা পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ গড়তে সক্ষম।

শ্রেণী বিষয়ে মার্কসীয় মতবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেনিন শ্রেণীর একটা বিশদ সংজ্ঞা দেন। তিনি লেখেন: 'সামাজিক উৎপাদনের ইতিহাস-নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় নিজেদের স্থান, উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক (অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা আইন রূপে বিধিবদ্ধ), শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা, সুতরাং যে সামাজিক সম্পদ তাদের হাতে রয়েছে তার কতটা অংশ ও পাবার উপায় অনুসারে লোকেদের পৃথক বড়ো বড়ো দলকে বলা হয় শ্রেণী। শ্রেণী হল লোকেদের তেমন সব গ্রুপ, সামাজিক অর্থনীতির নির্দিষ্ট

ব্যবস্থায় তাদের বিভিন্ন স্থানের দরুন একদল অপর দলের শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে।'*

প্রতিটি শ্রেণীকে দেখতে হবে উৎপাদনের যে প্রণালী থেকে তাদের জন্ম তার সঙ্গে জড়িত করে। তার অর্থ, উৎপাদনের প্রতিটি বৈরমূলক প্রণালী থেকে সমাজ তার পক্ষে বৈশিষ্ট্যসূচক শ্রেণীতে ভেঙে যায় (দাসতান্ত্রিক সমাজে প্রভু আর দাস, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্ত এবং অধীনস্থ কৃষক, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিপতি আর প্রলেতারিয়েত)। এ থেকে দাঁড়ায় যে শ্রেণীর প্রকৃতি ও মর্মার্থ সঠিকভাবে বুঝতে হলে কোনো একটা সুনির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে তার সম্পর্ক দৃষ্টিচ্যুত করা চলে না।

উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে সম্পর্ক থেকেই নির্ধারিত হয়ে যায় শ্রমের সামাজিক সংগঠনে শ্রেণীর ভূমিকা এবং সামাজিক সম্পদ পাবার উপায় ও পরিমাণ। এই প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছেন: 'শ্রেণীদের মধ্যে পার্থক্যের মৌল লক্ষণ হল সামাজিক উৎপাদনে তাদের স্থান, সুতরাং উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে।'**

প্রতিটি শ্রেণীর থাকে উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে

---

* V. I. Lenin, 'A Great Beginning', *Collected Works*, Vol. 29, Progress Publishers, Moscow, 1977, p. 421.

** V. I. Lenin, 'Vulgar Socialism and Narodism as Resurrected by the Socialist-Revolutionaries', *Collected Works*, Vol. 6, 1977, pp. 262-263.

সুনির্দিষ্ট নিজস্ব সম্পর্ক। এই লক্ষণ দিয়েই পার্থক্য করা যায় শ্রেণী আর অন্যান্য সামাজিক গ্রুপের মধ্যে যারা শ্রেণী নয়। যেমন, উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের নিজস্ব কোনো সম্পর্ক নেই, তাই তারা শ্রেণী নয়।

উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে **শ্রমের সামাজিক সংগঠনে** শ্রেণীগুলির **ভূমিকা**। সামাজিক উৎপাদনে বিভিন্ন কাজ করে শ্রেণীরা। বৈরগর্ভ সমাজে একদল উৎপাদন চালায়, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যাপারের পরিচালনা করে, ব্যাপৃত থাকে প্রধানত মননধর্মী শ্রমে। অন্য শ্রেণীরা বাধ্যতামূলক গুরুভার কায়িক শ্রম চালায়।

সামাজিক উৎপাদন তথা সমগ্র সমাজজীবনের বিকাশ ও জটিলতা বৃদ্ধির ফলে পরিচালনার বিভিন্ন কাজের প্রয়োজন হয়। যেমন, প্রাচীন কালের প্রাচ্য দেশগুলিতে বড়ো বড়ো সেচ ব্যবস্থাগুলির জন্য এমন কেন্দ্রীভূত পরিচালন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছিল যা ছোটো ব্যক্তিগত অর্থনীতির পক্ষে দরকার হত না। সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপ, বৃহদাকারে উৎপাদনের পরিচালনা ছাড়া বর্তমানের বৃহৎ যন্ত্রশিল্প অকল্পনীয়। শ্রেণী সমাজে সামাজিক উৎপাদনের পরিচালনা সাধারণত ন্যস্ত থাকে সেই শ্রেণীর হাতে যারা উৎপাদনের উপায়ের মালিক। আসলে উৎপাদন পরিচালনার কাজটাই নির্ভর করে মালিকানা সম্পর্কের ওপর। উৎপাদনী উপায়ের মালিক প্রভু শ্রেণী পরিচালনায় আসতে দেয় কেবল নিজ শ্রেণীর লোকেদের। তাই, দৃষ্টান্তস্বরূপ, পুঁজিপতি

উৎপাদন চালাচ্ছে বলে পুঁজিপতি হয়েছে, তা নয়, উলটে সে উৎপাদন চালাচ্ছে পুঁজিপতি বলেই।

কিন্তু কোনো একটা উৎপাদনী সম্পর্ক যখন উৎপাদনী শক্তি বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন শ্রমের সামাজিক সংগঠনে প্রভু শ্রেণীর ভূমিকাতেও পরিবর্তন ঘটে। উৎপাদনে নিজের সাংগঠনিক ভূমিকা হারিয়ে সে অধঃপতিত হয় সমাজদেহের ওপর একটা পরগাছায়। এককালে অভিজাত ভূস্বামীদের সেই দশা হয়েছিল, এখন তাই ঘটছে বুর্জোয়ার ক্ষেত্রে, পরিচালনার সাংগঠনিক কাজটা তারা তুলে দিচ্ছে টেকনিকাল বুদ্ধিজীবীদের ওপর মহলের হাতে।

সামাজিক আয়ের ভাগ পাবার উপায় ও পরিমাণেও শ্রেণীদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। বৈরী শ্রেণীদের সমাজে তা নির্ভর করে শোষণের রূপের ওপর। দাসপ্রভুরা দাসদের কাছ থেকে বাড়তি উৎপন্ন আদায় করত একেবারে অনাবৃত বলপ্রয়োগের মাধ্যমে। সামন্তরা কৃষকদের বহিরর্থনৈতিক বাধ্যকরণের মাধ্যমে খাজনা আদায় করত। পুঁজিপতিরা যে মুনাফা পায় তার উৎস হল শ্রমিকের তেমন শ্রম যার মূল্য দেওয়া হয় নি। শোষক ও শোষিত শ্রেণী সামাজিক সম্পদের যে পরিমাণ ভাগ পায় তার মধ্যে প্রচণ্ড পার্থক্য থাকে। প্রথমেরা যেখানে পায় সিংহভাগ, দ্বিতীয়রা সেক্ষেত্রে পায় সামান্য, প্রায়ই মাত্র সেইটুকু যাতে অনাহারে না মারা যায়।

আয় পাবার পরিমাণ ও উপায়ের মধ্যে পার্থক্য শ্রেণীগুলির বৈশিষ্ট্যসূচক হলেও সেটাই তাদের

নির্ধারক লক্ষণ নয়। আয়ের উৎস ও পরিমাণে সীমাবদ্ধ থাকলে শ্রেণীকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা, বহু সামাজিক স্তর ও গ্রুপ থেকে তফাৎ করা যাবে না, তারাও বিভিন্ন উৎস থেকে আয় পেতে পারে। যেমন পুঁজিতন্ত্রে আয়ের উৎস হয় বিভিন্ন, রাজপুরুষেরা বেতন পায় রাষ্ট্র থেকে, ডাক্তারেরা বিভিন্ন লোককে চিকিৎসার জন্য পায় দক্ষিণা। কিন্তু এতে করে তাদের বিভিন্ন শ্রেণী বলে গণ্য করার কারণ থাকে না। শ্রেণীকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে তার সমস্ত লক্ষণ বিচার করা এবং তাদের অচ্ছেদ্য ঐক্যে দেখা দরকার।

শ্রেণী বিভাগ হয় সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আত্মিক জীবন নিয়ে। শ্রেণী বিভাগ চলে শ্রেণী সমাজের ওপর থেকে নিচু পর্যন্ত সমগ্র সত্তা ধরে, সামাজিক সম্পর্কের গোটা ব্যবস্থায় তা ব্যাপ্ত। কিন্তু শ্রেণী বিভাগের ভিত্তিটা সর্বাগ্রে সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সম্পর্কে, যাতে শোষক শ্রেণীরা শোষিতদের শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে। এইসব সম্পর্কের সমষ্টিতে গড়ে ওঠে সমাজের শ্রেণী কাঠামো, শ্রেণী সংগ্রামের বৈষয়িক, অর্থনৈতিক ভিত্তি। তবে শ্রেণীদের মধ্যে সম্পর্ক কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটাতেই সীমাবদ্ধ নয়, তার প্রকাশ, বলতে-কি সবচেয়ে কেন্দ্রীভূত প্রকাশ ঘটে রাজনৈতিক জীবনে। শেষত, শ্রেণীগুলির মধ্যে সম্পর্ক, তাদের সংগ্রাম প্রকাশ পায় ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে, সমাজের আত্মিক জীবনে।

সমাজের শ্রেণী কাঠামো বিশ্লেষণে মার্কসবাদ-

লেনিনবাদ **মৌল** আর **অমৌল** শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য করে। মৌল শ্রেণী হল তারা যাদের অস্তিত্ব সরাসরি নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটির উৎপাদনের প্রাধান্যকারী প্রণালী দ্বারা নির্ধারিত। প্রতিটি বৈরগর্ভ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল দুটি মৌল শ্রেণীর অস্তিত্ব। যেমন, দাসমালিক আর দাস, সামন্ত আর কৃষক, বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েত। মৌল শ্রেণীগুলির বৈরীবিরোধের অবসান হয় বিদ্যমান ব্যবস্থার স্থলে নতুন, বেশি প্রগতিশীল ব্যবস্থার আগমনে। সমাজতান্ত্রিক সমাজেও আছে দুটি মৌল শ্রেণী — শ্রমিক শ্রেণী আর কৃষক। কিন্তু তাদের মধ্যে সম্পর্ক একত্র শ্রম ও সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

শ্রেণী ব্যবস্থায় উৎপাদনের প্রাধান্যকারী প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে বজায় থাকতে পারে পূর্বতন উৎপাদন প্রণালীর জের, অথবা দেখা দিতে পারে অর্থনীতির বিশেষ ধারা হিশেবে নতুন উৎপাদন প্রণালীর অঙ্কুর। **অমৌল** বা **উত্তরণশীল** শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব এই ঘটনাটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

যেমন দাসতান্ত্রিক সমাজে মৌল শ্রেণীগুলির (প্রভু আর দাস) সঙ্গে সঙ্গে ছিল বণিক, কুসীদজীবী, স্বাধীন কারুজীবী, কৃষক, বেশ কিছু পরিমাণ শ্রেণীহীন লোকেরাও। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নগরগুলির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে নতুন নতুন সামাজিক স্তর: কর্মশালা আর সমবায়ে সংঘবদ্ধ কারুজীবী, ব্যবসায়ী, ইত্যাদি। পুঁজিতান্ত্রিক দেশে দীর্ঘকাল টিকে থেকেছিল, এবং সামন্ততান্ত্রিক জের যেখানে বেশি ছিল

সেখানে এখনো অমৌল শ্রেণী হিশেবে টিকে আছে জমিদার — বৃহৎ ভূস্বামী।

অধিকাংশ পুঁজিতান্ত্রিক দেশে রয়েছে জনবহুল পেটি-বুর্জোয়া স্তর: ক্ষুদে খামারি, কারুজীবী, দোকানদার ইত্যাদি। সংখ্যার দিক দিয়ে এরা বড়ো একটা সামাজিক স্তর, রাজনৈতিক সংগ্রামে এরা কম ভূমিকা নেয় নি। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এদের প্রতিনিধিরা হল বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মাঝখানে। বুর্জোয়ার সঙ্গে তার মিল এইখানে যে তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক। অবশ্য ব্যক্তিগত যে পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানা শ্রমনির্ভর নয়, তার সঙ্গে এর তফাৎ আছে, এ সম্পত্তি ব্যক্তিগত শ্রমের ওপর প্রতিষ্ঠিত, ফলে পেটি বুর্জোয়া হয়ে দাঁড়ায় প্রলেতারিয়েতের আত্মীয়।

মৌল ও অমৌল শ্রেণীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। ব্যাপারটা এই যে মৌল শ্রেণীরা তাদের ঐতিহাসিক বিকাশে পরিণত হয় অমৌলে, অন্যদিকে আবার ইতিহাসের নির্দিষ্ট পর্যায়ে যে শ্রেণী অমৌল হিশেবে আবির্ভূত, কালক্রমে তা পরিণত হতে পারে মৌলে। শ্রেণীর মৌল থেকে অমৌলে উত্তরণের কারণ উৎপাদনের প্রাধান্যকারী প্রণালী কালক্রমে আর সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রাধান্যকারী থাকে না। অমৌল শ্রেণী মৌল হয়ে ওঠে প্রধানত এইজন্য যে কোনো একটা ব্যবস্থার গর্ভে দেখা দেয় নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক ধারা, কালক্রমে তা পরিণত হয় উৎপাদনের প্রাধান্যকারী প্রণালীতে।

সমাজজীবনে রাজনৈতিক পার্টির — কোনো একটা

শ্রেণী বা স্তরের সবচেয়ে সক্রিয় ও সংগঠিত অংশের থাকে একটা বিশেষ স্থান ও ভূমিকা। রাজনৈতিক পার্টির অস্তিত্ব সমাজের শ্রেণী বিভাগের সঙ্গে, শ্রেণীগুলির স্বার্থপার্থক্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রাজনৈতিক পার্টি হল গুরুত্বপূর্ণ সেই হাতিয়ার যার সাহায্যে শ্রেণী তার স্বার্থের জন্য, ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম করে। রাজনৈতিক পার্টি হল শ্রেণী সংগঠনের সর্বোচ্চ রূপ।

রাজনৈতিক পার্টির উদ্ভব শ্রেণী সমাজ বিকাশের আদি পর্যায়ের সঙ্গে জড়িত। বর্তমান সমাজে, তার শ্রেণী কাঠামো অনুসারে পার্টি হতে পারে বুর্জোয়া, প্রলেতারীয়, জমিদার, কৃষক আর পেটি-বুর্জোয়া। জোটবদ্ধ শ্রেণীর স্বার্থবাহক পার্টিও হয় যেমন, বুর্জোয়া-জমিদার পার্টি, প্রলেতারীয় আর পেটি-বুর্জোয়া ব্লকের পার্টি ইত্যাদি। মাঝে মাঝে, বিশেষ করে বহু জাতির রাষ্ট্রগুলিতে পার্টি জাতীয় বর্ণ ধারণ করে এবং সাধারণ জাতীয় লক্ষ্য পেশ করে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তাদের ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে থাকে শ্রেণী স্বার্থ। একথা খাটে ধর্মীয় এবং অন্যান্য পার্টির বেলাতেও। শ্রেণী দেখা দেয় লোকেদের ইচ্ছা ও চেতনার বাইরে, তার সঙ্গে রাজনৈতিক পার্টির তফাৎ এই যে তা গড়ে লোকেরা এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য তা কাজ চালায় সচেতনভাবে। পার্টি হল স্বেচ্ছামূলক সামাজিক সংগঠন।

আধুনিক রাজনৈতিক পার্টিগুলির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্মসূচি থাকে, সুনির্দিষ্ট পলিসি অনুসরণ করে, তাদের থাকে সাংগঠনিক নীতি ও তদনুযায়ী অভ্যন্তরীণ

সংগঠন — নিয়মাবলী, সভ্যদের গঠন, স্থানীয় পার্টি সংগঠন, কমিটি, কংগ্রেস, সদস্য চাঁদা, ইত্যাদি। আধুনিক রাজনৈতিক পার্টির সাধারণত থাকে নিজস্ব সংবাদপত্র ও প্রকাশালয়, লোকসভা ও আত্মশাসনের স্থানীয় সংস্থাগুলিতে নিজেদের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে ন্যূনাধিক সংগঠিত নিজেদের পক্ষভুক্ত গ্রুপ।

২। শ্রেণী এবং অন্যান্য সামাজিক গ্রুপ

শ্রেণী ছাড়াও সামাজিক গঠনের মধ্যে থাকে বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপ, স্তর ও উপস্তর। সমাজজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যে উপস্তর, তারা হল intelligantsia বা **বুদ্ধিজীবী** (লাতিন intelligens থেকে জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত, মননশীল)। এই সামাজিক গ্রুপের মধ্যে পড়ে তেমন লোক যারা পেশাদার হিশেবে জটিল মানসিক শ্রমে নিযুক্ত এবং তদুপযোগী বিশেষ শিক্ষার অধিকারী। বিশেষ সামাজিক উপস্তর হিশেবে বুদ্ধিজীবীর উদ্ভব ও অস্তিত্ব মানসিক ও কায়িক শ্রমে সামাজিক বিভাজনের সঙ্গে জড়িত। দাসতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজেও বুদ্ধিজীবী ছিল, কিন্তু বহুসংখ্যক লোকের বিশেষ একটা উপস্তর হিশেবে তা রূপ নেয় কেবল পুঁজিতন্ত্রেই।

বুদ্ধিজীবীরা শ্রেণী নয় কেননা উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে তাদের নিজস্ব সম্পর্ক নেই। সেই সঙ্গে সমাজে বিদ্যমান শ্রেণীগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং

তাদের চাহিদা মেটানোয় নিযুক্ত থাকায় তারা সমাজজীবনে বড়ো একটা সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে।

দাসতান্ত্রিক এবং বিশেষ করে সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল সমাজের সম্প্রদায়ভিত্তিক গঠন। **সম্প্রদায়** হল এমন সামাজিক গ্রুপ যাদের অধিকার ও কর্তব্য রীতিনীতি বা আইনে বিধিবদ্ধ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তা বর্তায়। সম্প্রদায়ের রূপলাভ একটা সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া, বিভিন্ন সমাজে তা এগিয়েছে বিভিন্নভাবে এবং সম্পত্তিগত অসাম্য আর সুনির্দিষ্ট সামাজিক কাজ (সামরিক, ধর্মীয়, বৃত্তিগত ইত্যাদি) গড়ে ওঠা ও আইনে বিধিবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে তা জড়িত। কিন্তু লোকেদের সাম্প্রদায়িক বিভাগের ভিত্তিতে ছিল সর্বাগ্রে তাদের অর্থনৈতিক, শ্রেণীগত অবস্থান। যেমন, দাসতান্ত্রিক যে সমাজ ছিল স্বাধীন নাগরিক ও দাসেদের নিয়ে, তাতে স্বাধীনদের মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপ পৃথক হয়ে ওঠে যাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আইনী সুযোগসুবিধা ছিল বিভিন্ন।

সামন্ততন্ত্রে বিশেষ সুবিধাভোগী সর্বোচ্চ সম্প্রদায় ছিল অভিজাত ও যাজকেরা। তৃতীয়, সর্বনিম্ন সম্প্রদায়ে ছিল কৃষক, কারুজীবী, ব্যবসায়ী। নিম্নতন সম্প্রদায় কর দিতে বাধ্য ছিল। উচ্চ সম্প্রদায়গুলির ছিল অর্থনৈতিক ও আইনী বিশেষ সুবিধা: তারা ছিল সম্পত্তি ও ভূমিদাস কৃষকের মালিক, কর থেকে মুক্ত, নিজেদের বিশেষ সম্প্রদায়গত আদালতের কাছে দায়ী ইত্যাদি। কোনো একটা সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্তি চলে

আসত উত্তরাধিকার সূত্রে, এক সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়ে চলে যাওয়া সাধারণত বারণ, সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যসূচক দিক ছিল তার আত্মবদ্ধতা। সম্প্রদায় ব্যবস্থার ভাঙন জড়িত পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে, যা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিশেষ সুবিধার জায়গায় আনে ধনের বিশেষ সুবিধা। তবে সম্প্রদায় বিভাগের জের বর্তমান বুর্জোয়া সমাজেও টিকে আছে।

লোকেদের সবচেয়ে স্বতন্ত্র ও আত্মবদ্ধ গ্রুপ হল জাত বা castes (লাতিন castus থেকে — খাঁটি)। এটা লোকেদের জন্মগত গ্রুপ, সমাজে যাদের এক-একটা বিশেষ স্থান থাকে, ঐতিহ্যগত বৃত্তির সঙ্গে তারা জড়িত এবং পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান তাদের সীমাবদ্ধ। কোনো না কোনো রূপে জাতের লক্ষণ দেখা যায় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় অনেক রাষ্ট্রে (প্রাচীন মিসর ও ইরানে বিশেষ সুবিধাভোগী পুরোহিত সম্প্রদায়, জাপানে সামুরাই ইত্যাদি) তবে কেবল ভারতেই জাতিভেদ পরিণত হয়েছে একটা স্বকীয় ধরনের সামাজিক ব্যবস্থায়।

সামাজিক গ্রুপগুলির মধ্যে পার্থক্য অতি বিচিত্র রূপ ধারণ করতে পারে। যেমন সমাজে থাকে নগর আর গ্রামাঞ্চল, শিল্প ও কৃষিতে নিযুক্ত লোকেদের মধ্যে পার্থক্য। প্রতিটি শ্রেণী সমাজে এই ভাগগুলির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কৃষক ও সামন্তদের শ্রেণী কেন্দ্রীভূত ছিল প্রধানত গ্রামাঞ্চলে আর শহরে থাকত প্রধানত কারুজীবী, ব্যবসায়ী,

জায়মান বুর্জোয়া। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে সমস্ত সামাজিক স্তরই যেমন শহরে তেমনি গ্রামে ছড়ানো, যদিও ঠিক একই মাত্রায় নয়। এই থেকে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়াকে ভাগ করা হয় শহুরে ও গ্রাম্য, শ্রমিক শ্রেণী হয় শিল্প ও কৃষি প্রলেতারিয়েত ইত্যাদি।

শ্রেণীর অভ্যন্তরে গ্রুপে গ্রুপে পার্থক্যও সামাজিক পার্থক্যের অন্তর্গত। যেমন, বুর্জোয়ার অভ্যন্তরে উৎপাদনী উপায়ের আয়তন, পরিমাণ অনুসারে থাকে ছোটো, মাঝারি ও বৃহৎ পুঁজিপতি।

বুর্জোয়ার মধ্যে একচেটিয়া আর একচেটিয়া নয়, একচেটিয়াদের মধ্যে যেসব গ্রুপ সরাসরি সমর শিল্পের সঙ্গে, অর্থনীতির সামরীকরণের সঙ্গে জড়িত, তাদের ভাগাভাগিটাও মনে রাখা দরকার। এই শেষোক্তরা হল বুর্জোয়ার সবচেয়ে জঙ্গী অংশ, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পলিসিতে প্রায়ই নির্ধারক প্রভাব ফেলে তারা।

সমাজে এমন লোকেদের ন্যূনাধিক তাৎপর্যপূর্ণ উপস্তর থাকতে পারে, যারা নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়, অথবা এমন লোক যারা শ্রেণীচ্যুত, নিজ শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়েছে (যেমন, পুঁজিতন্ত্রে লুম্পেন-প্রলেতারিয়েত, কোনো নির্দিষ্ট পেশা যাদের নেই, যারা একেবারে 'নিচুতে' তলিয়েছে — ভিখারী, বেশ্যা, চোর-ছ্যাঁচড় ইত্যাদি)।

শ্রেণী ছাড়াও সমাজে থাকে লোকেদের অন্যান্য বড়ো বড়ো এমন গ্রুপ, যাদের ভাগটা শ্রেণী অনুসারে নয়, অন্য ধারায়। লোকেদের মধ্যে বয়স, লিঙ্গ, অধিজাতি (race), জাতি, পেশা ইত্যাদি দিক থেকে পার্থক্য

থাকে। তার কতকগুলির কারণ প্রাকৃতিক, (বয়স, লিঙ্গ), কতকগুলির সামাজিক। লোকেদের প্রাকৃতিক পার্থক্য থেকে এমনিতে কোনো সামাজিক পার্থক্য দেখা দেয় না, কেবল নির্দিষ্ট এক-একটা সামাজিক পরিস্থিতিতেই সেগুলিকে সামাজিক অসমতার সঙ্গে যুক্ত করা যায়। যেমন, বর্ণবৈষম্য কোনো স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, ঐতিহাসিক ঘটনা। নারীদের সামাজিক অসাম্যের পেছনেও আছে ঐতিহাসিক কারণ। ইতিহাসের আদি ধাপগুলোয় সমাজে নারীদের স্থান ছিল শ্রদ্ধেয়, পরে সেটা তারা হারায় উৎপাদনে নারীদের ভূমিকা পরিবর্তনের ফলে। শ্রেণী বিভাগ কিন্তু প্রাকৃতিক পার্থক্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। শ্রেণী বিভাগ থাকে একই অধিজাতি, নরকৌলিক গ্রুপ ইত্যাদির মধ্যে।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ

১। শ্রেণীহীন সমাজ — আদিম ব্যবস্থা

শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে আমাদের দিন থেকে অনেক অতীত কালে। তবে লোকেদের অতি প্রাচীন বসতি ও সমাধিগুলির প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, তা থেকে আমাদের সুদূর পূর্বপুরুষদের সামাজিক জীবন ও কাজকর্মের একটা ছবি অনুমান করা সম্ভব। শ্রমের হাতিয়ার সে যুগে ছিল অতি সরল এবং বানানো হত সাধারণত পাথর কিংবা কাঠ দিয়ে। তার সাহায্যে লোকে বড়ো বড়ো শক্তিশালী পশু শিকার করত, সংগৃহীত বন্য উদ্ভিদের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিও ছিল খাদ্য। লোকেদের পারস্পরিক সাহায্য ছাড়া সে সময় নিজেদের অন্ন সংস্থান অথবা হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা, কিছুই সম্ভব ছিল না। তাই লোকে

থাকত, শিকার আর ফলমূল সংগ্রহ করত একসঙ্গে। থাকত তারা বড়ো বড়ো দল বেঁধে, নিজেদের মধ্যে পার্থক্য ছিল বাসভূমি, লোকসংখ্যা আর ভাষায়। এই ধরনের বড়ো বড়ো দল হল কৌলিক মেল আর উপজাতি।

প্রাচীন সমাজে শ্রেণী ছিল না, অধীনতা ও পীড়নের সম্পর্ক ছিল না, শোষণ ছিল না। সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় নিজেদের স্থানের দিক থেকে কুল বা উপজাতির সদস্যদের মধ্যে এমন কোনো পার্থক্য ছিল না যা কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ। যৌথ শ্রম ক্রিয়ায় লোকে জীবনধারণের উপকরণ আহরণ করত এবং উৎপাদিত সবকিছুও ভোগ করত যৌথভাবে। আদিম সমাজে উৎপাদনের উপায়ের ওপর ছিল সামাজিক মালিকানা, ফলে কুল বা উপজাতির সমস্ত সদস্যই ছিল নিজেদের মধ্যে সমান। শ্রম বিভাগ এখানে ঘটে প্রথমে পুরুষ ও নারীর মধ্যে, তাছাড়া বিভিন্ন বয়স অনুসারে, পরে শ্রমের ধরন অনুযায়ী কৃষক, পশুপালক আর শিকারী উপজাতিদের মধ্যে। শ্রমের সংগঠন দেখত যৌথের বয়স্ক এবং সর্বাধিক অভিজ্ঞ লোকেরা — কুলপিতা, উপজাতি প্রধানেরা। কিন্তু তারা বিশেষ, সুবিধাভোগী একটা শ্রেণী ছিল না: প্রথমত, তারা অধিবাসীদের মধ্যে বড়ো একটা গ্রুপ নয়। নিজেদের দায়িত্ব পালন করত কুল বা উপজাতির অধিকাংশের সম্মতিক্রমে। সামাজিক শ্রমের সংগঠন ব্যবস্থায় তাদের বিশেষ স্থানটা সম্পত্তি বা শক্তির দৌলতে নয়, মর্যাদার জন্য।

তাছাড়া আদিম ব্যবস্থায় সম্পদের যে ভাগ পেত

কুলাপিতা ও উপজাতি প্রধানেরা, তার পরিমাণ ও পাবার পদ্ধতি অন্য সদস্যদের থেকে বিশেষ পৃথক হত না। আদিম ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদনী শক্তির অসাধারণ নিচু মান, সেই অনুসারে শ্রমের উৎপাদনশীলতাও ছিল অত্যন্ত নিচু। সে যুগে লোকে উৎপাদন করত এত কম যে উৎপাদিত সবকিছু তৎক্ষণাৎ ফুরিয়ে যেত। তাই সামাজিক অসাম্য উদ্ভবের ভিত্তি ছিল না।

বিভিন্ন কুল আর উপজাতিদের মধ্যে মাঝে মাঝে যে সংঘাত বাধত, তাতে যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে কী করা যাবে, এই সমস্যা দেখা দিল। নিজেদের গোষ্ঠীতে রেখে দেওয়া চলত না, কেননা নিজেদেরই খাবারে কুলাত না। বন্দীদের খাটানোও চলত না, কেননা অভাব ছিল শুধু ভোগ্যবস্তুতে নয়, শ্রমের উপায়েও। তাই বন্দীদের হয় মেরে ফেলা হত, নয় যুদ্ধশেষে ছেড়ে দেওয়া হত, কিংবা সমান অধিকারে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হত গোষ্ঠীতে। তাই আদিম ব্যবস্থায় অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে পৃথক পৃথক স্থায়ী গ্রুপ ছিল না। এটা ছিল শ্রেণীহীন সমাজ।

প্রাচীন শ্রেণীহীন সমাজে লোকেদের জীবনযাত্রার একটা ধারণা পাওয়া যায় একালের কিছু কিছু জনগোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত থেকে, যাদের বিকাশ নির্দিষ্ট কিছু ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কারণে আটকে থেকেছে।

২। আদিম ব্যবস্থার ভাঙন ও শ্রেণীর উদ্ভব

আদিম ব্যবস্থার ভাঙনের যুগে শ্রেণী দেখা দেয় ও রূপ লাভ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সুদীর্ঘ এই প্রক্রিয়া চলেছে বিভিন্ন সময়ে। ইতিহাসের তথ্য অনুসারে, শ্রেণী সমাজ গড়ে ওঠে খ্রিঃপূঃ ৪র্থ সহস্রকের শেষ ও ৩য় সহস্রকের গোড়ায় প্রাচীন মিসর, আসিরিয়া আর বাবিলনে; খ্রিঃপূঃ ৩য়-২য় সহস্রকে প্রাচীন ভারত আর চীনে; খ্রিঃপূঃ ১ম সহস্রকে প্রাচীন গ্রীস এবং পরে প্রাচীন রোমে।

অধিকাংশ লাতিন আমেরিকান দেশে, বিশেষ করে কিউবায় শ্রেণী সমাজ দেখা দেয় অনেক পরে, স্পেনীয় ঔপনিবেশিকদের আগমনে। বহু আফ্রিকান দেশে শ্রেণী প্রথম দানা বাঁধতে থাকে সেখানে ঔপনিবেশিকতার পতনের পরে, অর্থাৎ বিশ শতকের মাঝামাঝি। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আফ্রিকার কতকগুলি দেশে শ্রেণী গঠনের প্রক্রিয়া এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। তবে বর্তমানে ইতিমধ্যেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে মানবজাতি তার বিকাশে শ্রেণী সমাজের পর্যায় দিয়ে যায়। এটা একটা সাধারণ ঐতিহাসিক নিয়মসঙ্গতি। অবশ্য এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নানা দেশে শ্রেণী রূপায়ণ ও শ্রেণী সম্পর্ক বিকাশের প্রক্রিয়া তাদের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত।

শ্রেণী সমাজ উদ্ভবের সর্বাধিক সাধারণ পূর্বশর্ত ছিল উৎপাদনী শক্তির বিকাশ। এ প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত এমন মাত্রায় বৃদ্ধি পায় যখন লোকে জীবনধারণের জন্য

প্রয়োজনের চেয়েও বেশি উৎপাদন করে। দেখা দিল বাড়তি উৎপন্ন, 'নিজস্ব প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত', ফলে দেখা দিল সামাজিক অসাম্য।

কিছু অতিরিক্ত উৎপাদন হওয়ার ফলে অর্থনীতির দিক থেকে সম্ভব হল কিছু লোকের বাকিদের পরিশ্রমে বেঁচে থাকা। এই সম্ভাবনা কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হল ব্যক্তিগত মালিকানায়। উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধির ফলে যখন দেখা দিল গোষ্ঠীতে উৎপাদন উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা, যখন আগেকার যৌথ উৎপাদনের স্থানে এল এক-একটা পরিবারের শক্তিতে স্বতন্ত্র উৎপাদন, তখন লোকেদের মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য হয়ে উঠল অনিবার্য। সমাজের শ্রেণী বিভাজনের পূর্বশর্ত এইগুলির সঙ্গে জড়িত।

শ্রেণী গড়ে ওঠে দুই ধারায়। প্রথমে গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে কুলীন অভিজাতদের মধ্য থেকে শোষক শীর্ষের উদ্ভব হয়। অন্য ধারায় যুদ্ধবন্দীদের, পরে উপজাতির অভ্যন্তরে ঋণগ্রস্ত নিঃস্বদের দাস করা হত।

ন্যূনাধিক সাম্যের গোষ্ঠীতে শোষক শীর্ষ দেখা দিল কেমন করে? গোষ্ঠীর পরিচালকদের অবস্থা প্রথম দিকে তার সাধারণ সদস্যদের মতো একইরকম ছিল। সাধারণ স্বার্থ রক্ষার কাজ চলত গোটা সমাজের তত্ত্বাবধানে। এই সাধারণ স্বার্থের মধ্যে পড়তে পারত কলহের মীমাংসা, জলাশয়ের তত্ত্বাবধান, ধর্মাচরণ। যে লোকেরা সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করত, তাদের খানিকটা কর্তৃত্ব, রাষ্ট্রক্ষমতার মতো কিছু অধিকার ছিল, কিন্তু মোটের ওপর তারা ছিল গোষ্ঠীর সেবক।

উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধি আর গোষ্ঠীগুলি বৃহত্তর হয়ে ওঠার ফলে শ্রম বিভাগের প্রসার ঘটে, সাধারণ স্বার্থ রক্ষা আর কলহের মীমাংসার জন্য বিশেষ সংস্থা গড়ে ওঠে। গোটা দলের স্বার্থের প্রতিনিধি হিশেবে এই সংস্থাগুলি এক-একটা গোষ্ঠীতে বিশেষ স্থান গ্রহণ করতে থাকে এবং ক্রমশ বেশি স্বাধীনতা লাভ করতে থাকে। সামাজিক কর্তব্যে নিযুক্ত লোকেদের এই স্বাধীনতা কালক্রমে সমাজের ওপর প্রভুত্বে পর্যবসিত হয়। পূর্বতন সেবকেরা ক্রমশ পরিণত হল প্রভুতে।

শ্রেণী গঠনের আরেকটা পথ হল যুদ্ধবন্দীদের দাস করায়। সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় অতিরিক্ত শ্রমশক্তির প্রয়োজন, সেটা নিজেদের গোষ্ঠীতে ছিল না। এই শ্রমশক্তি যোগাতে থাকে যুদ্ধ। বন্দীদের জীবন রক্ষা করে তাদের খাটতে বাধ্য করা হয়ে দাঁড়াল কার্যোপযোগী এবং লাভজনক। প্রাচীন মিসরীয়রা যুদ্ধবন্দীদের যে নাম দিয়েছিল তার আক্ষরিক অর্থ হল 'জীবন্ত মৃত'। পরে এই কথাতেই সমগ্র দাসশ্রেণী বোঝানো হত। দাসেরা প্রাণে বেঁচে থাকল, কিন্তু মানুষের অধিকার পেল না।

কালক্রমে অসাম্য, প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক প্রসারিত হল উপজাতির সেই অংশেও যারা গোষ্ঠীর পরিচালকদের কাছে ঋণে বাঁধা পড়েছিল।

ব্যক্তিগত উৎপাদনের প্রসার কেবল একটা প্রাথমিক ধাক্কা দেয় সামাজিক অসাম্য উদ্ভবের ক্ষেত্রে। **সামাজিক শ্রম বিভাগের** ফলে চূড়ান্ত রূপে ভেঙে পড়ে আদিম গোষ্ঠী, লোপ পায় কৌমিক ব্যবস্থা।

প্রথম বড়ো আকারের সামাজিক শ্রম বিভাগ লোকসাধারণের মধ্য থেকে পশুপালক উপজাতি উদ্ভবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নিজেদের প্রয়োজনের চেয়ে কিছু অতিরিক্ত জমে উঠতে থাকে তাদের। সেটা তারা প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্য বিনিময় করত কৃষকদের সঙ্গে। প্রথম দিকে এরূপ বিনিময়ের চরিত্র ছিল আপতিক, পরে পশুপালক ও কৃষক উপজাতিদের মধ্যে নিয়মিত বিনিময়ের পরিস্থিতি গড়ে উঠল। তার ফলে আবার বেড়ে উঠল সামাজিক সম্পদ, ব্যাপকভাবে দাস শ্রমের নিয়োগ।

দ্বিতীয় বৃহৎ সামাজিক শ্রম বিভাগ কৃষি থেকে কারিগরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সঙ্গে জড়িত। তাতে গোষ্ঠীর অভ্যন্তরেই বিনিময় প্রচলিত হয় ও অর্থনৈতিক অসাম্য বৃদ্ধি পায়। স্বাধীন ও দাসে সমাজের ভাগাভাগির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য। উৎপাদনের ক্রমেই বেশির ভাগটা সরাসরি বিনিময়ের জন্য উৎপন্ন হয়ে থাকায় বিভিন্ন উৎপাদকদের মধ্যে বিনিময় পরিণত হল একটা সামাজিক প্রয়োজনে।

সামাজিক শ্রম বিভাগের আরো বিকাশে দেখা দিল **কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য।** মানসিক শ্রম হয়ে দাঁড়াল অল্পসংখ্যকের একচেটিয়া, তারা প্রভু শ্রেণী, উৎপাদনের, সামাজিক ব্যাপারের পরিচালনা তারা কেন্দ্রীভূত করে নিজেদের হাতে। আর সমাজের বিপুল অধিকাংশের ভাগ্যে পড়ল গুরুভার কায়িক শ্রম।

শ্রম বিভাগে লোকে কর্মের নির্দিষ্ট এক-একটা রূপের সঙ্গে বাঁধা পড়ে, আর ব্যক্তিগত মালিকানায় লোকেরা বিভক্ত হয় উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ও শ্রমের ফল আত্মসাৎ করার ধরন অনুসারে। উৎপাদনের উপায়ের মালিকের পক্ষে সে উপায় থেকে বঞ্চিতদের শোষণ করার বাস্তব সুযোগ থাকে। ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পর্ক আর সে সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত সামাজিক শ্রম বিভাগের ঐক্যেই উৎপাদনী শক্তির নির্দিষ্ট একটা বিকাশের স্তরে শ্রেণী দেখা দেয়।

সমাজের বিকাশে শ্রেণীর উদ্ভব কি একটা প্রগতিশীল ঘটনা? পৃথক একটি লোকের ভাগ্য দেখা যাক। ছিল সে স্বাধীন, তারপর ধরা যাক যুদ্ধে নিজেদের উপজাতির পরাজয়ের ফলে হঠাৎ দাস হয়ে পড়ল। এটা তার জীবনে মোটেই প্রগতিশীল একটা ব্যাপার নয়। কিন্তু যদি মনে রাখি যে আরো অতীত কালে বন্দীকে অবশ্য অবশ্যই মেরে ফেলা হত, তাহলে দাসত্বের মূল্যেও তার জীবন রক্ষা পাওয়াটা প্রগতিশীল।

মানবজাতির বিকাশকে যদি সমগ্রভাবে ধরা যায়, তাহলে উত্তরটা একইরকম হবে না। জনগণের বিপুল অংশকে দাসে, শোষিত ও নিষ্পীড়িতে পরিণত করায় বৃহৎ আকারে সামাজিক শ্রম বিভাগ সম্ভব হয়। ঠিক এই পথেই মানবিক সংস্কৃতি বিকাশের পরিস্থিতি গড়ে উঠেছিল। এইভাবে শ্রেণীর উদ্ভব হল মানব সমাজের ইতিহাসে একটা আবশ্যক ঘটনা। শ্রেণীর উদ্ভব ও শ্রম বিভাগের ফলে মানবিক সামর্থ্য বিকাশে সাহায্য হয়েছে যদিও একই সঙ্গে তা ধ্বংসও পেয়েছে। বৈরগর্ভ সমাজে

প্রগতি হল মার্কসের কথায়, সেই অসভ্য দেবমূর্তির মতো যে সুধা পান করে কেবল নিহতের করোটি থেকে (সুধা আছে, কিন্তু করোটিও আছে)।

৩। দাসতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী

দাসতান্ত্রিক সমাজে ছিল তিনটি শ্রেণী। প্রথম শ্রেণী — **দাসপ্রভু**, আদি যুগে কৌলিক অভিজাতদের ওপরমহল, পরে ধনীদের আরো প্রসারিত স্তর নিয়ে গঠিত। দ্বিতীয় শ্রেণী হল **স্বাধীন গোষ্ঠীসদস্যরা** — কৃষক, পশুপালক, কারুজীবী; কালক্রমে তারাও সাধারণত দাসপ্রভুদের অধীনস্থ হয়েছে। পরিশেষে, তৃতীয় শ্রেণী হল বহুভাষী, বহু উপজাতির বিচিত্র জনপুঞ্জ **দাসেদের** নিয়ে।

দাসতান্ত্রিক সমাজের আদি পর্যায়ে দাসত্ব যখন একটা ব্যাপক চরিত্র ধারণ করে নি, তখন ভূমিজীবী গোষ্ঠীসদস্যরাই ছিল সমাজের অধিকাংশ। স্বাধীন গোষ্ঠীসদস্যরা ছিল ক্ষুদে উৎপাদক, কৃষিতে খাটত এবং গোষ্ঠী আর জায়মান রাষ্ট্রের অধীনে থাকত। তারা ছিল শ্রমের হাতিয়ার, পশুপাল, বাসগৃহ, বীজ ইত্যাদির মালিক। গোষ্ঠীর সদস্য হিশেবে তার অধিকারে থাকত নির্দিষ্ট কিছু আবাদ জমি, এবং সাধারণ বারোয়ারি সম্পত্তি ভোগ করত। নিজের শ্রমের সংগঠন সে নিজেই করত, উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক ছিল সে, তার বিলিব্যবস্থা করত। তার বেশির ভাগটা সে নিজে পরিবারের সঙ্গে ভোগ করত। মাংস, শস্য, অন্যান্য

খাদ্যদ্রব্য সে উৎপন্ন করে জমিয়ে রাখত যাতে পরের ফসল অবধি চলে যায়। তার উৎপন্ন দ্রব্যের একাংশ নেওয়া হত রাষ্ট্রের উপকারে। খুব সামান্য একটা অংশ সে আলাদা করে রাখত এমন কারুদ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় করার জন্য যা সে নিজে উৎপন্ন করে না।

একদল লোকের সম্পত্তি বৃদ্ধি আর অন্যদল ধ্বংস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য যে শ্রেণীটি ক্রমেই জনবহুল হয়ে উঠছিল, তারা হল দাস। দাসশ্রম ব্যবহৃত হত অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে। দাসেরা ছিল প্রভুর পুরোপুরি অধীনে। দাসেদের মালিক হত সাধারণত স্বতন্ত্র এক-একজন ব্যক্তি। তবে কোনো দেশে, যেমন প্রাচীন ভারতে গোষ্ঠী সম্পর্ক যেখানে ছিল খুবই দৃঢ়, সেখানে দাসেরা থাকত গোটা গোষ্ঠীর অধীনে। উৎপাদনের নিজস্ব হাতিয়ার এবং অন্যান্য উপায় দাসদের থাকত না। নিজেদের শ্রমের সংগঠক ছিল না তারা, কেবল প্রভুর নির্দেশ পালন করত।

উৎপাদনী শক্তি সেসময় বৃদ্ধি পাচ্ছিল খুবই ধীরে ধীরে। উৎপাদনের হাতিয়ার ছিল বড়োই স্থূল আর আদিম ধরনের। নিজেদের শ্রমফলে আগ্রহ থাকত না দাসদের। এই পরিস্থিতিতে নিয়মিত বাড়তি উৎপন্ন পাওয়া সম্ভব ছিল কেবল সোজাসুজি দৈহিক বাধ্যকরণ মারফত। বহিরর্থনৈতিক বাধ্যকরণের এই প্রয়োজনীয়তা হল শ্রম শোষণের দাসতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসূচক দিক।

দাস ব্যবস্থায় শোষণের রূপ ছিল চূড়ান্ত রকমের নিষ্ঠুর। দাস কতদিন বাঁচবে তাতে দাসপ্রভুর আগ্রহ

থাকত না। তাই যথাসম্ভব কম সময়ে দাসের কাছ থেকে যথাসম্ভব বেশি আদায় করে নেবার চেষ্টা করত সে। দাসেদের মৃত্যুহার ছিল খুবই বেশি। নির্মম শোষণের ফলে দাসেরা মারা যেত প্রায়ই ৭-৮ বছরের মধ্যে।

দাসশ্রমের এইরূপ শোষণের ফলে দেশের অভ্যন্তরে শ্রমশক্তির নিয়মিত পুনরুৎপাদন সম্ভব হত না। দাসেদের সন্তানেরাও দাস হত বটে, কিন্তু দাসেদের সংখ্যা পূরণের প্রধান উপায় ছিল যুদ্ধ, দস্যুতা। ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে স্বাধীন নাগরিকদেরও বেচে দেওয়া হত দাস হিশেবে।

দাসপ্রভু ছিল উৎপাদনের প্রধান উপায়াদির (ভূমি, পশুপাল, শ্রমের হাতিয়ার) মালিক, তাছাড়া সেসব উপায়েরও মালিক যা দিয়ে দাস কেনা সম্ভব হত। তাই অন্যান্য ধরনের সম্পত্তি ছাড়াও উৎপাদনের কর্মীরাও ছিল তাদের সম্পত্তি। দাসমালিকেরা ছিল যেমন সরাসরি তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিশেবে শ্রমের সংগঠক। দাসপ্রভুদের ধনের প্রধান উৎস ছিল অধীনস্থ দাসেদের সৃষ্ট বাড়তি উৎপন্ন। ধনের পরিপূরক উৎস ছিল ঋণে বাঁধা পড়া স্বাধীন কৃষকদের কাছ থেকে পাওয়া সঙ্গতি। তাছাড়া যেসব উপজাতি ও জাতিসত্তা দাসপ্রভু রাষ্ট্রের অধীনস্থ তাদের কাছ থেকে পাওয়া সঙ্গতির একাংশও তাদের হাতে আসত।

দাসতান্ত্রিক সমাজে গড়ে ওঠে কারিগর শ্রেণীও — স্বাধীন ক্ষুদে উৎপাদকদের শ্রেণী, যারা রাষ্ট্রের অধীন, বাণিজ্যের সঙ্গে, বাজারের সঙ্গে জড়িত। কারুকর্মের

প্রসার বৃদ্ধি পায় নানা কারণে। অর্থনীতি যথেষ্ট বিকাশ পায়, গড়ে উঠতে থাকল নগর, দেখা দিল লোহাস্ত্রে সশস্ত্র, রথ এবং অন্যান্য টেকনিকে সজ্জিত বড়ো বড়ো সৈন্যবাহিনী। তাছাড়া দাসপ্রভুদের হাতে ধন সঞ্চিত হওয়ায় দেখা দিল বিলাস দ্রব্যের চাহিদা। এসবের ফলে সাহায্য হয় কারুকর্মের বিকাশে।

উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপায় ছিল কারুজীবীর। কর হিশেবে রাষ্ট্রকে সে যা দিত, তা ছাড়া নিজের উৎপাদিত দ্রব্যের মালিক হত সে। এদিক থেকে কারুজীবী আর কৃষিজীবীর মধ্যে সাদৃশ্যে সন্দেহ নেই। তবে তাদের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট। কারুজীবীর মতো কৃষকও ক্ষুদে উৎপাদক, কিন্তু বেশির ভাগ দ্রব্য সে উৎপাদন করে নিজ পরিভোগের জন্য। পক্ষান্তরে কারুজীবী উৎপাদন করত বিনিময়ের জন্য, বাজারে বিক্রির জন্য।

উৎপাদনের দাসতান্ত্রিক প্রণালী বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক শ্রমকে হটিয়ে ছড়াতে থাকে দাস শ্রম। ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষকদের দিয়ে গড়ে ওঠে পুঞ্জীভূত লুম্পেন-প্রলেতারিয়েত। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেটা দেখা গিয়েছে প্রাচীন রোমে। সেখানে দাসতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্বের শেষ শতকে তার গর্ভে নতুন সম্পর্ক দেখা দিতে থাকে, যা সূচিত করে সামন্ততন্ত্রে উৎক্রমণ। বড়ো বড়ো দাসতান্ত্রিক লাতিফুন্দাগুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে যেতে থাকে, সেগুলি চষত কলোনাসরা। তারা ঠিক পুরোপুরি দাস ছিল না, দাসদের যখন যেভাবে খুশি বেচে দেওয়া যেত। কলোনাসদের ধরা হত জমির দাস।

অন্য মালিকের হাতে তাদের তুলে দেওয়া যেত কেবল জমির সঙ্গে।

৪। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী

উৎপাদনের প্রণালী পরিবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দাসতান্ত্রিক সমাজের স্থান নিল সামন্ততান্ত্রিক। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ছিল প্রাকৃতিক, আত্মবদ্ধ, চেষ্টা করত নিজেদের সমস্ত চাহিদা স্বাধীনভাবে মেটাতে। এখানে শোষণের হাতিয়ার হল জমির সঙ্গে কৃষককে বাঁধা। ভূস্বামীরা, সামন্ত-জমিদাররা কৃষকদের মধ্যে জমি বেঁটে দেয় এই শর্তে যে কৃষকদের তাদের জন্য চাষ করতে হবে। বাড়তি উৎপন্ন পাবার জন্য ভূস্বামীকে তার জমিতে এমন কৃষক পাওয়া চাই যার একটা প্লট, চাষের হাতিয়ার, পশুপাল আছে। যে চাষীর জমি নেই, পশুপাল নেই, ব্যবস্থাপনা নেই, সামন্ততান্ত্রিক শোষণের পক্ষে সে অলাভজনক। চাষী ছিল ব্যক্তিগতভাবে জমিদারের অধীন, কেননা জমি পাবার পর জমিদারের জন্য তাকে খাটানো যেতে পারত কেবল বাধ্যকরণের পথে। অর্থনীতির সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্ভর করে বহিরর্থনৈতিক বাধ্যকরণ, ভূমিদাসপ্রথা, জমিদারের নিকট কৃষকের আইনি অধীনতা, তাদের অধিকার হ্রাসের ওপর।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রধান শ্রেণী হল সামন্ত ভূস্বামী আর ভূমিদাস কৃষক। জমিদারদের থাকত বড়ো বড়ো ভূসম্পত্তি, তাছাড়া তাদের ওপর নির্ভরশীল

কৃষক, যাদের সে ভূমির সঙ্গে অথবা ভূমি ছাড়াও বেচে দিতে পারত। জমিদাররা বা তাদের গোমস্তারা ছিল জমিদারের জমিতে অথবা বাড়িতে কৃষকদের খাটুনির সংগঠক। বাড়তি উৎপন্ন দ্রব্যের বড়ো অংশটা পেত জমিদার, অন্য অংশটা রাষ্ট্র আর গির্জা।

ভূমিদাস কৃষকেরা ছিল সামন্ত-জমিদার, রাষ্ট্র আর গির্জার অধীন। তাদের থাকত বাসগৃহ, পশুপাল, শ্রমের হাতিয়ার এবং এক টুকরো জমি যা তারা পেত হয় গ্রামগোষ্ঠী অথবা সরাসরি জমিদারের কাছ থেকে। তারা নিজেদের ও পরিবারের শ্রমের সংগঠক হিশেবে খাটতে পারত কেবল যখন কাজ করত নিজের জমিটায়।

দাসেদের মতো ভূমিদাস কৃষকেরাও ছিল মালিকের ব্যক্তিগত অধীনতায় এবং তার জন্য খাটতে বাধ্য। কিন্তু দাসের সঙ্গে তার তফাৎ এই যে ভূমিদাসকে সামন্তের পুরোপুরি সম্পত্তি বলে ধরা হত না। ভূমিদাসকে জমিদার কিনতে বা বেচতে পারত কিন্তু আইনত খুন করতে পারত না। দাস থেকে ভূমিদাসের আরেকটা পার্থক্য, তার কিছু সম্পত্তি থাকত। তাছাড়া সে ছিল গ্রাম গোষ্ঠীর সদস্য, তার পেষকতা লাভ করত। দাসপ্রথার তুলনায় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল ইতিহাসের দিক থেকে প্রগতিশীল।

উৎপাদনের সামন্ততান্ত্রিক প্রণালীতে ধরে নেওয়া হয় উৎপাদনী শক্তির উচ্চতর বিকাশ, নিজের শ্রমের ফলে উৎপাদকের আগ্রহ বাড়ে। বিভিন্ন উপজাতির দাসেদের জনপুঞ্জের জায়গায় এল গ্রাম গোষ্ঠীতে সংঘবদ্ধ ভূমিদাস কৃষক।

প্রধান দুই শ্রেণী ছাড়াও সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ছিল স্বাধীন কৃষকদের শ্রেণী। এ শ্রেণীর লোকসংখ্যা সুস্থির থাকে নি, কখনো বেড়েছে, কখনো কমেছে, নির্ভর করত তা অনেক কারণের ওপর। যেমন রাশিয়ায় কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে সামন্ততন্ত্রের প্রস্ফুরণের সময় স্বাধীন কৃষক গোষ্ঠী বিলুপ্ত হয়, সমস্ত জমি কণ্টিত হয়ে যায় জমিদার, গির্জা আর বড়ো বড়ো রাজপুরুষদের মধ্যে। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দেখা দেয় গোষ্ঠীভুক্ত স্বাধীন কৃষকদের ভালোরকম বসতি। ভূমিদাস নয়, স্বাধীন কৃষকদের একটা ভূমিবলয়ের অস্তিত্ব সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র মেনে নেয়, কারণ দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্ত রক্ষায় তার আগ্রহ ছিল।

এই পর্বে প্রচণ্ড বিকাশ ঘটে নগরগুলির, তাতে দেখা দেয় নতুন নতুন সামাজিক স্তর: কর্মশালা আর সমবায়ে সংঘবদ্ধ কারুজীবী, বণিক প্রভৃতি। প্রথম দিককার কারুজীবীরা ছিল কর্মশালা (শহরে কারুজীবীদের সংগঠন) রাষ্ট্র ও গির্জার অধীনস্থ ক্ষুদে উৎপাদক। আদি সামন্ততন্ত্রের পর্বে যখন শহর আর বাণিজ্য ছিল কম বিকশিত, তখন অধিকাংশ কারুজীবীদের কিছু জমি থাকত শহরের কাছাকাছি, তারা বহু পরিমাণে নিজেদের খাদ্যের ব্যবস্থা করে নিত। বাণিজ্য, নগর, কর্মশালা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কর্মশালাগুলির অভ্যন্তরেও পার্থক্য দেখা দিতে থাকে। এদিকে ভাগ হয়ে যায় উৎপাদনের হাতিয়ারের মালিক ধনী ওস্তাদেরা। অন্যদিকে গরিব যোগাড়ে, শিক্ষানবিশ, যারা ওস্তাদের জন্য খাটে এবং পয়সা পায়। তবে ষোলো শতক পর্যন্ত

এই মজুরেরা একটা বিশেষ শ্রেণী হয়ে ওঠে নি। শুধু পরে, আদি পুঁজি সঞ্চয়ের পর্বে ক্ষুদে উৎপাদকেরা যখন ব্যাপকভাবে উৎপাদনের উপায় হারাল, মজুরি খাটা যোগাড়ে শিক্ষানবিশদের এই গোটা দলটা মিলে গিয়ে গড়ে তুলল নতুন শ্রেণী — প্রলেতারিয়েত। আর তাদের কর্তা বণিক আর কুসীদজীবীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে গড়ে তুলল বুর্জোয়া শ্রেণীর ঝনিয়াদ। কৃষকদের ওপর মহল থেকেও বেরিয়ে আসে পুঁজিপতি ধরনের লোকজন।

৫। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণী

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের মৌল শ্রেণী হল বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েত। বুর্জোয়া শ্রেণী গঠিত অশ্রমজীবী বৃহৎ মালিকদের নিয়ে, শিল্পে, তথা কৃষিতে উৎপাদনের উপায় যাদের দখলে। তারাই হল নিজেদের উদ্যোগাদিতে শ্রমের সংগঠক, এবং মজুরি খাটা শ্রমিকদের দাম-না-দেওয়া শ্রমে সৃষ্ট মুনাফা হিশেবে আত্মসাৎ করে বাড়তি উৎপন্ন।

যে শ্রেণী বুর্জোয়ার বিপরীতে দণ্ডায়মান এবং সেই সঙ্গে বুর্জোয়ার অস্তিত্বের জন্য আবশ্যক শর্ত, তারা হল প্রলেতারিয়েত। তা গঠিত মজুরি খাটা শ্রমিকদের নিয়ে যারা যেমন উৎপাদনের, তেমনি জীবন ধারণের উপায় থেকেও বঞ্চিত। বেঁচে থাকার জন্য শ্রমিকেরা বাধ্য হয় পুঁজিপতিদের কাছে ভাড়া খাটতে, বিক্রি করে তাদের খাটবার সামর্থ্য, অর্থাৎ শ্রমশক্তি। পুরোপুরি

দাসপ্রভুর সম্পত্তি দাস অথবা স্বল্পাধিকারভোগী ভূমিদাস কৃষকের তুলনায় শ্রমিকেরা আইনত স্বাধীন। তাহলেও পুঁজিপতির কাছে তাদের অধীনতা আসলে কম নয়, শুধু তার রূপটা অন্যরকম। উৎপাদনের উপায় থেকে শ্রমিক বঞ্চিত। তাদের আছে শুধু শ্রমশক্তি, তারা বাঁচতে পারে কেবল সেটা বিক্রি করে। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শ্রমশক্তি কিনে তা কাজে লাগাতে পারে কেবল পুঁজিপতি — উৎপাদনী উপায়ের মালিক। শ্রমিকেরাও বাধ্য হয় পুঁজিপতির কাছে দাসত্ব মেনে নিতে।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের পর্যায় অনুযায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীও কতকগুলি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যায়। সামন্ততন্ত্রের পর্কে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে 'বুর্জোয়া' কথাটায় বোঝাত শহরবাসী। কারুকর্ম, পণ্য উৎপাদনের বিকাশে শহরবাসীদের মধ্যে শ্রেণীভেদ ঘটতে থাকে। বুর্জোয়া শ্রেণীর রূপলাভ জড়িত সেই যুগটার সঙ্গে, যাকে বলা হয় পুঁজির আদি সঞ্চয়ের যুগ (পনেরো শতকের শেষ থেকে আঠারো শতক)। তার প্রধান কথা ছিল ব্যাপক জনসাধারণের জমি ও শ্রমের হাতিয়ার বাজেয়াপ্ত, আর তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন আর দখলদারি। এই সময় গড়ে ওঠে উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক প্রণালীর উদ্ভব ও বিকাশের শর্ত: দেখা দিল ব্যক্তিগত অধীনতা থেকে মুক্ত এবং উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত মজুরি খাটা শ্রমিকদের বড়ো একটা দল; বুর্জোয়ার হাতে জমল প্রচুর মুদ্রা পুঁজি। উৎপাদনী শক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে

আগেকার কর্মশালাগুলির স্থান নিল ম্যানুফ্যাকচার পরে বৃহৎ যন্ত্রশিল্প। উৎপাদন যখন এল শিল্প পুঁজির দখলে, তখন উৎপাদনের প্রাধান্যকারী প্রণালী হিশেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল পুঁজিতন্ত্র।

বুর্জোয়া বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায় হল শিল্প বিপ্লব ও প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের পর্ব। এই পর্বেও পুঁজিপতি শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি চলতে থাকে, তাতে যাদের প্রাধান্য ছিল তারা বিশেষ বৃহৎ ধরনের উদ্যোক্তা নয়। পুঁজি নিয়োগের ক্ষেত্র অনুসারে এই সময়কার বুর্জোয়ারা শিল্পপতি, বণিক, ব্যাংকার আর খামার-মালিক।

বুর্জোয়া বিকাশের তৃতীয় পর্যায় হল একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র, বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের পর্ব। উনিশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশ আর বিশ শতকের গোড়ায় ফিনান্স পুঁজি আধিপত্য লাভ করতে থাকে, দেখা দেয় কোটিপতি, শতকোটি পতিরা, ধ্বংস পায় ছোটো আর মাঝারি উদ্যোক্তাদের বড়ো একটা অংশ, চলে উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রীভবন আর পুঞ্জীভবন। এর ভিত্তিতে দেখা দেয় এবং দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকে একচেটিয়া সংঘ। পুঁজিবাদ যে পর্যায়ে প্রবেশ করল তাকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদ।

সাম্রাজ্যবাদের পর্বে অধিবাসীদের মধ্যে বুর্জোয়ার অংশ ক্রমাগত হ্রাস পাবার একটা প্রবণতা লক্ষণীয়। বর্তমানে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে বুর্জোয়ারা কর্মরত অধিবাসীদের ১·৫-২ শতাংশ। অথচ সামাজিক সম্পদের সিংহভাগ এই শ্রেণীরই হাতে।

পুঁজিতন্ত্র বিকাশের প্রথম পর্বে বুর্জোয়ারা ছিল প্রগতিশীল শ্রেণী, তাদের ক্রিয়াকলাপের দৌলতেই গড়ে ওঠে প্রবল উৎপাদনী শক্তি আর এই শ্রেণীর লোকেরাই উৎপাদনের সংগঠনে বড়ো একটা ভূমিকা নেয়, কিন্তু বর্তমানে বুর্জোয়ারা হল সামাজিক বিকাশের প্রতিবন্ধক একটা শ্রেণী। এমনকি উৎপাদন সংগঠনের কাজও ক্রমেই তুলে দেওয়া হচ্ছে চাকুরিজীবী ব্যবস্থাপক আর সংগঠন বিশেষজ্ঞদের হাতে। সেইসঙ্গে বৃহৎ ফিনান্স গোষ্ঠীতন্ত্র আর সমরশিল্প কমপ্লেক্সের প্রতিনিধি হিশেবে ঠিক বুর্জোয়ারাই হয়েছে ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোজ এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে যুদ্ধের সংগঠক।

শ্রমিক শ্রেণীও পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের পর্যায়াদি অনুযায়ী বিকাশের কয়েকটা ধাপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কৃষক আর শহরের গরিবেরাই ছিল প্রধান সামাজিক স্তর যাদের মধ্যে থেকে ষোলো-আঠারো শতকের ম্যানুফ্যাকচারের প্রলেতারিয়েত পৃথক হয়ে ওঠে। তাদের প্রাক্‌প্রলেতারিয়েতও বলা হয়। আঠারো শতকের শেষ আর উনিশ শতকের মাঝামাঝির মধ্যে শিল্প বিপ্লবের ফলে, অর্থাৎ শিল্পের সমস্ত প্রধান শাখায় যান্ত্রিক, কলকারখানাভিত্তিক উৎক্রমণ প্রসঙ্গে দেখা দেয় শিল্প প্রলেতারিয়েত।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনে কেবল যে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধিতেই সাহায্য হয়েছে তাই নয়, পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের সচেতনতা, সংগঠনশীলতা, ঐক্যবদ্ধতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিকাশের প্রথম পর্যায়ে

প্রলেতারিয়েত যে সংখ্যায় অল্প ছিল শুধু তাই নয়। প্রধান কথা, এটা ছিল তেমন শ্রেণী যাদের সমস্ত ভরসাই অতীতের সঙ্গে জড়িত। শ্রমিকেরা তখনো বুঝত না যে তাদের প্রধান শত্রু পুঁজিতন্ত্র তাই বুর্জোয়ার সঙ্গে শ্রমিকদের সংগ্রাম প্রকাশ পেত এক-একজন মালিকের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত হাঙ্গামার আকারে, কখনো কখনো তা যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রূপ নিত। শ্রমিকেরা ভাবত যে তাদের প্রধান শত্রু হল ওই চক্ষুশূল যন্ত্রগুলো যা অবিরাম ঘুরে যাচ্ছে। আর তখন শ্রমদিন চলত ১২-১৪ ঘণ্টা, কাজ শেষের পর একেবারে ক্লান্ত শ্রমিকেরা বাড়ি ফিরতে পারত কোনোক্রমে। ওই যন্ত্রই তাদের কষ্টের কারণ ভেবে সেগুলো তারা ভেঙে ফেলত। পুঁজিপতিরা কিন্তু আবার বসাত নতুন যন্ত্র, সবই শুরু হত আগের মতোই।

বিদ্যমান সমাজকে সমস্ত মেহনতিদের স্বার্থে পুনর্গঠিত করতে সক্ষম, তেমন একটা সামাজিক শক্তি, একটা শ্রেণীতে পরিণত হবার জন্য প্রলেতারিয়েতকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। সর্বাগ্রে, শ্রমিক শ্রেণীর বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে বৃত্তি, জাতি, বয়স ইত্যাদির পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের স্বার্থ যে এক সে বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে হয়েছে। সচেতন হতে হয়েছে যে তাদের স্বার্থ পুঁজিপতির স্বার্থের বিপরীত। শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যন্তরে বুর্জোয়া যে প্রতিযোগিতার প্ররোচনা দেয় তার বিরুদ্ধে তাদের সংগঠিত হতে হয়েছে নিজেদের শ্রেণীগত রাজনৈতিক পার্টিতে। এবং

শেষত, সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী যখন রাষ্ট্রক্ষমতা পুনর্গঠনের জন্য শ্রেণী সংগ্রামে অবতীর্ণ হল তখন তারা নতুন একটা ঐতিহাসিক শক্তি রূপ শ্রেণী হিশেবে চূড়ান্ত আকার ধারণ করল।

শ্রমিক শ্রেণীর রূপগ্রহণ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় মার্কস দুটি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন: 'নিজেরা শ্রেণী' আর 'নিজেদের জন্য শ্রেণী'।* পুঁজিতান্ত্রিক, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বর্তমান শ্রেণী রূপায়ণ প্রক্রিয়া বোঝার জন্য এই পার্থক্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজি যখন বিপুল সংখ্যক মজুরি খাটা শ্রমিকদের একই অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে ফেলে, তখন শ্রমিকদের এই জনপুঞ্জ শ্রেণী হয়ে দাঁড়ায় পুঁজির সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে, অর্থাৎ তারা 'নিজেরা শ্রেণী'। আর প্রলেতারিয়েত 'নিজেদের জন্য শ্রেণী' অর্থাৎ রূপান্তরসাধক ঐতিহাসিক শক্তি হয়ে ওঠে কেবল সংগ্রামে, যার ফলে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে, সাধারণ বিশ্ববীক্ষা, সাধারণ কর্মসূচি রচনা করতে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে পারে।

বর্তমান কালেও শ্রেণীর রূপলাভ প্রক্রিয়া চলেছে এবং খুব সম্ভব আরো বড়ো আকারে ও আরো উদ্দাম বেগে। পুঁজিতান্ত্রিক যুগের ঊষালগ্নের চেয়ে এ প্রক্রিয়ার চরিত্র এখন অনেক বেশি জটিল। উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপুল বেড়ে উঠেছে মজুরি

* Karl Marx, Frederick Engels, *Collected Works*, Vol. 6, Progress Publishers, Moscow, 1979, p. 211-212.

খাটা মেহনতির সংখ্যা। উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত এবং পুঁজি কর্তৃক শোষিত এই মেহনতিদের বৃহদাংশটারই অর্থনৈতিক অবস্থা একইরকম, অর্থাৎ তারা হল 'নিজেরা শ্রেণী'। কিন্তু মেহনতিদের কিছু কিছু গ্রুপ পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনে এসে পড়েছে সম্প্রতি এবং অধিবাসীদের অতি বিভিন্ন সব স্তর থেকে, চেতনা, শিক্ষা, সংস্কৃতির মান, জীবনযাত্রার ধরন, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, বেতনের পরিমাণে তাদের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। স্বভাবতই এই ধরনের মজুরি খাটা মেহনতি প্রায়ই নিজেদের গণ্য করে না শ্রমিক শ্রেণীর অংশ বলে। আর 'নিজেদের জন্য শ্রেণী' হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া একটা জটিল ও দীর্ঘকালীন ব্যাপার।

উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতিতে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই থাকে সামন্ততান্ত্রিক, এমনকি পিতৃতান্ত্রিক অর্থনীতির উপাদান। শ্রেণীর রূপলাভ প্রক্রিয়া সেখানে আরো জটিল।

প্রায় কোনো দেশেই পুঁজিতন্ত্র 'বিশুদ্ধ' রূপে বিদ্যমান থাকে না। পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের পাশেই সাধারণত থাকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পূর্বতন ব্যবস্থার জের। বিশেষত, কিছু দেশে টিকে আছে সামন্ততন্ত্রে প্রভুত্বকারী জমিদার শ্রেণীর একাংশ।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে থাকে ক্ষুদে মালিকদের জনবহুল স্তরাদি, তাদের বড়ো একটা অংশ হল কৃষকেরা, সেইসঙ্গে শহুরে পেটি বুর্জোয়ারা (বিশেষ করে সার্বিসের ক্ষেত্রে: পেট্রল স্টেশন, মোটরগাড়ি মেরামতের কারখানা, ছোটো দোকান ইত্যাদির মালিক)।

চতুর্থ অধ্যায়

বর্তমান সমাজের শ্রেণী বিন্যাস

১। উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রেণী বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রেণী বিন্যাসে গত একশ বছরে এমন কোনো আমূল পরিবর্তন ঘটে নি যাতে শ্রেণী বৈপরীত্য মুছে যায়। সমাজের এক প্রান্তে ঐশ্বর্য বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে অন্য প্রান্তের প্রলেতারীয়ভবন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলির মধ্যে বুর্জোয়া সমাজের শ্রেণী বিন্যাস হয়ে উঠেছে আরো বেশি সুস্পষ্ট। উৎপাদনী শক্তির বিকাশ খরবেগ বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল প্রগতির ফলে উৎপাদনের অচল হয়ে আসা রূপগুলির সঙ্গে জড়িত গ্রুপগুলির লোকসংখ্যা প্রচণ্ড কমে গেছে।

কর্তা-মালিকদের মোট সংখ্যা কমে গেছে। অনেক বেড়ে গেছে মজুরি খাটা লোকেদের

বাহিনী, বেশি উন্নত দেশগুলিতে তারা উপার্জক মানুষদের ৭০-৮০ শতাংশ।

সেইসঙ্গে দেখা যাচ্ছে সামাজিক বিন্যাসে নতুন জটিলতার বেশ অটল একটা প্রবণতা। দ্রুতবেগে বাড়ছে বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা। পুঁজিতান্ত্রিক কোম্পানিগুলি চালাবার যন্ত্রব্যবস্থা হয়ে উঠছে জটিল, ফলে পরিচালন যন্ত্রের বিভিন্ন ধাপে কর্মনির্বাহক, ব্যবস্থাপকদের স্রোত বাড়ছে। উপার্জক লোকেদের শাখাভিত্তিক, বৃত্তিভিত্তিক, গুণভিত্তিক বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটছে অবিরাম।

উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির সামাজিক বিন্যাসে যা ঘটছে তার সাধারণ ধারা চিহ্নিত করতে হলে দুটো প্রধান ব্যাপারের কথা বলতে হয়: বর্তমানে সবচেয়ে প্রখর পরিবর্তন ঘটছে শ্রেণীতে শ্রেণীতে সম্পর্কে নয়, শ্রেণীগুলিরই অভ্যন্তরে। দেখা দিচ্ছে বহু অন্তর্বর্তী ও উৎক্রমণশীল সামাজিক গ্রুপ।

বর্তমান বুর্জোয়া সমাজের অধিপতি শ্রেণী তার গঠনের দিক থেকে বিগত যুগের বুর্জোয়া থেকে যথেষ্ট পৃথক। পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানার নতুন রূপের প্রসার, উৎপাদনের পুঞ্জীভবন ও কেন্দ্রীভবনের ফলে নির্দিষ্ট একটা ধাপে গড়ে ওঠে একচেটিয়া। দেখা দিল ফিনান্স পুঁজি। অবাধ প্রতিযোগিতার পুঁজিতন্ত্র পরিণত হল একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রে, পরে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রে। এসবের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যন্তরে তার কাঠামোয় গুরুতর পরিবর্তন না ঘটে পারে নি।

প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের যুগে বুর্জোয়া শ্রেণী গঠিত ছিল প্রায় পুরোপুরি কলকারখানার ব্যক্তিগত মালিকদের নিয়ে। বিশ শতকে ব্যাপক প্রচলন হয় যৌথ পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানার, যা আমাদের কালে ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর ক্রমেই বেশি করে আধিপত্য করছে।

প্রথম দিকে শেয়ার ছিল বড়ো বড়ো শেয়ারধারীদের স্বার্থে লাভজনক বিনিয়োগের জন্য পুঁজি এবং অধিবাসীদের বাড়তি টাকা জমা করার একটা রূপ। কালক্রমে শেয়ার বাজারে এত শেয়ার ছাড়া হয় যে মেহনতিদের মধ্যেকার অনেক লোকও হয়ে ওঠে শেয়ার-হোল্ডার। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা অমনি তার ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে এই বলে যে কোম্পানিগুলি পরিণত হচ্ছে 'জনগণের সম্পত্তিতে', 'জন পুঁজিতন্ত্রের যুগ' আসছে। আসলে এই ধরনের শেয়ার কিনে মেহনতি আদৌ পুঁজিপতি হয়ে ওঠে না, কোম্পানির ব্যাপার-স্যাপারের পরিচালনায় কোনোই অংশ নিতে পারে না সে।

'জনগণের শেয়ার' প্রচলনের উদ্দেশ্য মেহনতিদের পুঁজিপতিতে পরিণত করা নয়, মেহনতিদের সঞ্চয়টুকু বড়ো বড়ো শেয়ারধারীদের স্বার্থে কাজে লাগানো। শেয়ার-রূপী মালিকানার ধরনে উৎপাদনের কেন্দ্রী-ভবন একটা প্রবল প্রেরণা পায়, একচেটিয়ার উদ্ভবে সাহায্য হয় তাতে, শিল্পের সঙ্গে ব্যাঙ্কের মিলন অথবা সংযোজন আর ফিনান্স পুঁজির উদ্ভব সম্ভব হয়।

ফিনান্স পুঁজির উদ্ভবে দেখা দিল বুর্জোয়াদের নতুন স্তর — ফিনান্স অলিগার্কি, আর্থিক প্রভুগোষ্ঠী, সংখ্যায় অল্পকিছু লোক, কিন্তু তাদের হাতেই বিপুল সম্পদ থাকায় অত্যন্ত প্রতাপশালী। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক শতাংশেরও কম লোকের হাতে আছে শিল্প শেয়ারের ৮০ শতাংশ। ফিনান্স গোষ্ঠী কেবল এক-একটা একচেটিয়া সংঘ আর অর্থনৈতিক শাখাকেই নিয়ন্ত্রণ করে না, বুর্জোয়া সমাজের গোটা অর্থনীতির ওপরেই তার আধিপত্য। একচেটিয়া পুঁজি রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতে পরিণত হওয়ায় তার আধিপত্য বেড়েছে। রাষ্ট্র ক্ষমতার যন্ত্রকে, সমাজের গোটা রাজনৈতিক ও আত্মিক জীবনকে প্রভাবিত করার সুযোগ তাদের বিপুল।

ক্রমেই প্রভাবশালী হয়ে উঠছে একচেটিয়া ওপরমহলের আলাদা আরেকটা অংশ যারা সমরশিল্প কমপ্লেক্স -- সরকার, লোকসভা, সমর দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমরশিল্পের একচেটিয়াগুলোর জোট।

উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির বুর্জোয়া শ্রেণীর গঠনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে এই কারণেও যে এইসব দেশে রাষ্ট্রের কাজ ও হস্তক্ষেপ প্রসারিত হচ্ছে। রাষ্ট্র নিজেই হয়ে দাঁড়াচ্ছে উৎপাদনের উপায়ের বৃহৎ মালিক। এর ফলে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর মধ্যে দানা বাঁধছে রাজনৈতিক উচ্চকোটি আর উর্ধ্বতন আমলাতন্ত্রদের নিয়ে স্বাধীন একটা উপদল। দেখা দিচ্ছে পুঁজিপতিদের নতুন স্তর, 'রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র', যাদের

মধ্যে থাকছে জাতীয়কৃত ও মিশ্র কোম্পানিগুলির পরিচালকেরা।

উচ্চতন প্রশাসন-রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বাহকেরা (লোকসভাসদস্য, সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী, উচ্চতন রাজপুরুষ) রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের পরিস্থিতিতে হয়ে দাঁড়াচ্ছে অধিপতি শ্রেণীর ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক উচ্চকোটির অনেক প্রতিনিধিই একইসঙ্গে বৃহৎ কারবারের লোক। কারবার থেকেই তারা আসে এবং রাজনৈতিক জীবন শেষ হলে সেখানেই ফিরে যায়। কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক দেশের শাসক উচ্চকোটির লোক, দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশাদার রাজনীতিক যদি জনসাধারণের অন্য স্তর থেকেও এসে থাকে, তাহলেও তারা কার্যত হয়ে দাঁড়ায় আধিপত্যকারী শ্রেণীর প্রতিনিধি, কেননা তারা প্রকাশ করে এবং নিজেদের ক্রিয়াকলাপে অনুসরণ করে প্রভু শ্রেণীর অভিপ্রায়, যার জন্য তারা পায় মোটা টাকা যেটা আসলে আসে শ্রমিকদের উৎপাদিত দাম-না-পাওয়া বাড়তি মূল্য থেকে।

বড়ো বড়ো পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত কোম্পানিগুলির পরিচালকেরা (ম্যানেজারেরা) হয়ে উঠছে বুর্জোয়াদের ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ। তার কারণ স্বত্বাধীন পুঁজি আর কর্মে নিয়োজিত পুঁজি ক্রমেই লক্ষণীয় রূপে পৃথক হয়ে উঠছে আর বড়ো বড়ো কোম্পানির পরিচালকদের দেওয়া হচ্ছে বাণিজ্যক-উদ্যোগমূলক কাজ।

পরিচালকেরা যেহেতু নিয়োজিত কর্মচারী, তাই

পরিচালনার জন্য তারা যা পায় সেটা একধরনের বেতন। কিন্তু আসলে কোম্পানির প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষীয়রা যে বেতন আর অন্যবিধ পুরস্কারাদি পায়, তা অনুরূপ সুশিক্ষিত শ্রমের বাজার দরের চেয়ে বহুগুণ বেশি, সেটা হল পরের শ্রমে সৃষ্ট বাড়তি মূল্য আত্মসাৎ করায় অংশগ্রহণের রূপভেদ।

পরিচালনার কাজ পুঁজির মালিকানা থেকে পৃথক হওয়ায় কিছু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ এই কথা বলার অজুহাত পায় যে 'পরিচালকদের বিপ্লব' ঘটছে যেন, তার ফলে নাকি মালিকেরা কোম্পানির ওপর ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। তবে বাস্তবের সঙ্গে এরূপ তত্ত্বের কোনো মিল নেই। কোম্পানির পলিসির ওপর নির্ধারক প্রভাব থাকে তার, যার থাকে নির্ধারক পরিমাণ শেয়ার।

একচেটিয়া বুর্জোয়া তার ক্ষমতা খাটায় ব্যাঙ্ক আর শিল্প কোম্পানির পরিচালনায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমেও। সবচেয়ে ধনী পরিবারের লোকেরা একই সময়ে শিল্প, বাণিজ্যের কোম্পানি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কোম্পানিতে ডিরেক্টারের পদে থাকে। তাছাড়া কর্পোরেশনে ব্যবস্থাপনার উচ্চতম পদগুলিতে তারা পাঠায় নিজেদের পেটোয়া লোককে। এইভাবে বড়ো বড়ো মালিকেরাই অর্থনীতির ওপর তাদের ক্ষমতা আর নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে যায়। সেইসঙ্গে ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রব্যবস্থাটা থাকে সাধারণ লোকচক্ষুর আড়ালে।

বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের বিকাশ ও বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা বৃদ্ধির ফলে পশ্চিমী সমাজবিদ্যায় এমন সব তত্ত্ব দেখা দিয়েছে যা ঘোষণা করে যে সমাজের পূর্বতন শ্রেণী বিভাগ নাকি অচল হয়ে পড়েছে। এইসব তত্ত্ব অনুসারে নতুন শ্রেণী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে জ্ঞান ও গুণের ওপর। এই ধরনের মতামত প্রকাশ পাচ্ছে 'শিল্পোত্তর সমাজের' তত্ত্বাদিতে। এই তত্ত্বের অন্যতম স্রষ্টা মার্কিন সমাজবিদ ড্যানিয়েল বেল ঘোষণা করেছেন যে মালিকানা সম্পর্কে আমাদের ধারণা বহুকাল হল সেকেলে হয়ে গেছে। 'বর্তমানে মালিকানা স্রেফ একটা আইনি অলীকতা।'* বেলের মতে, অর্থনীতি এবং সমগ্রভাবে সমাজজীবনের পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা চলে আসছে একচেটিয়ার বদলে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানাদির হাতে। এইভাবে প্রাধান্যকারী শ্রেণীর ভূমিকা নিচ্ছে পুঁজিপতিরা নয়, বিজ্ঞানী ও পেশাদার প্রশাসকদের স্রষ্টা উচ্চকোটি।

আসলে কিন্তু পুঁজিপতিদের ক্ষমতার জায়গায় বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞদের ক্ষমতা মোটেই আসছে না। বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের ফলে শাসক শ্রেণীর গড়নে পরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু মালিকানা সম্পর্কটা থেকেই যাচ্ছে, কেবল তা হয়ে উঠছে অনেক জটিল। অর্থনীতির ওপর বৃহৎ পুঁজির নিয়ন্ত্রণ চলছে বিপুল পরিসরে এবং সুসঙ্গঠিত ও ঝাপ্‌সা রূপ নিচ্ছে। শাসক

---

* Daniel Bell. The Coming of Post-Industrial Society, Basic Books, N.Y. 1973, p. 294.

শ্রেণীর কিছু গ্রুপের সঙ্গে একচেটিয়ার যোগাযোগ বেশি চলছে মধ্যস্থ মারফত।

বিগত দশকগুলিতে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলির ক্রিয়াকলাপের পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দেখা দিচ্ছে বুর্জোয়ার একটা 'আন্তর্জাতিক উপস্তর'। উৎপাদনের যত আন্তর্জাতীয়করণ ঘটছে, বহুজাতিক কোম্পানিগুলির ক্রিয়াকলাপ বাড়ছে, ততই আধুনিক বুর্জোয়ার জাতীয় পার্থক্য মুছে যাচ্ছে।

যেসব পরিবর্তনের কথা বলা হল, তা সবচেয়ে বেশি ঘটছে বৃহৎ ও একচেটিয়া বুর্জোয়াদের ক্ষেত্রে। অধিকাংশ মাঝারি পুঁজিপতি নিজ ফার্মের পুঁজির ওপর মালিকানার সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোক্তার কাজও চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামীণ বুর্জোয়ার ধ্বংসপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া আরো চলেছে।

বুর্জোয়ার মূলগত শ্রেণী লক্ষ্যের ঐক্যে তার অভ্যন্তরে বিরোধ বৃদ্ধি নাকচ হয় না। এ শ্রেণীর কাঠামো যত জটিল হচ্ছে, তত বাড়ছে একচেটিয়া ওপরমহল আর সাধারণ পুঁজিপতিদের মধ্যে, পরিচালক-ম্যানেজার আর কর্মোদ্যোগী পুঁজিমালিকের মধ্যে, যারা উদ্যোগমূলক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত আর কেবল ডিভিডেণ্ট পায়, তাদের মধ্যে বিরোধ। বুর্জোয়াদের বহু স্তরের স্বার্থ ফিনান্স গোষ্ঠী বিশেষ করে সমরশিল্প কমপ্লেক্সের স্বার্থের সঙ্গে মেলে না।

কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলি শাসক শ্রেণীর অভ্যন্তরে বিরোধ বৃদ্ধির ব্যাপারটা হিশেবে রাখে এবং

শান্তি ও প্রগতির স্বার্থে একচেটিয়াবিরোধী ফ্রন্ট প্রসারিত ও সুদৃঢ় করার জন্য তা কাজে লাগায়।

পুঁজিতন্ত্র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে শ্রমিকদের সংখ্যা। উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে যেখানে বিকশিত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রলেতারিয়েতের অন্তর্গত ছিল ৮-৯ কোটি লোক, ১৯৫০ সালে সেখানে শোষিত শ্রমিক ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯ কোটি আর ১৯৮০ সালে ৫১ কোটি ৫০ লক্ষ আর তারাই হল কর্মরতদের ৭৫ শতাংশ।

এসব তথ্যে খণ্ডিত হয় 'প্রলেতারীয়তাচ্যুতির' বুর্জোয়া তত্ত্ব, যাতে বলা হয় যে বর্তমান বুর্জোয়া সমাজে শ্রমিক শ্রেণী সংখ্যায় কমছে, ক্রমশ তথাকথিত 'মধ্য শ্রেণীর' মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের কাছে 'মধ্য শ্রেণী' হল উৎপাদনী সম্পর্কের অন্য সমস্ত দিক নির্বিশেষে কেবল আয়ের মান অনুসারে ভাগ করে নেওয়া নানান সামাজিক-শ্রেণীগত গ্রুপের একটা জগাখিচুড়ি। যেন, আয়টা আসছে নিজের মালিকানাধীন উদ্যোগ থেকে নাকি মজুরি খেটে, তাতে একেবারেই কিছু এসে যায় না। গুরুত্বপূর্ণ শুধু একটা জিনিস: আয়ের পরিমাণটা যেন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পড়ে। ফলে 'মধ্য শ্রেণীর' মধ্যে দেখা যাচ্ছে শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে ছোটো বুর্জোয়া আর অন্যান্য সামাজিক স্তরের লোকেদেরও।

'প্রলেতারীয়তাচ্যুতি' তত্ত্বের পক্ষপাতীরা উপার্জক অধিবাসীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের মজুরদের অনুপাত হ্রাস, ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মীদের ও কর্মচারীদের ('নীল

কলার', উৎপাদক শ্রমিকদের সঙ্গে পার্থক্য টেনে 'শাদা কলার') দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির উল্লেখ করে।

সেটা সত্যি, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর গড়নে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু তাতে শ্রমিক শ্রেণী অন্তর্ধান করছে না, বরং তাতে সূচিত হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর সীমার প্রসারণ, তার গুণগত বিকাশ।

এই পরিবর্তনগুলি ঘটছে বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের বিকাশের ফলে, অর্থনীতির কাঠামোয় রদবদলে, যাতে দেখা দিচ্ছে নতুন নতুন ধরনের উৎপাদন, অর্থনীতির নতুন নতুন শাখা। বৈষয়িক উৎপাদনের শাখাগুলিতে উৎপাদনী শক্তির বিকাশ আর অনুৎপাদক ক্ষেত্রের দ্রুত বিকাশও এই দিকেই সক্রিয়। একচেটিয়া পুঁজির রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতে ত্বরান্বিত পরিণতিও শ্রমিক শ্রেণীর কাঠামোয় গুরুতর পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করছে। বদলে গেছে প্রলেতারিয়েতের চিরাচরিত বাহিনীগুলি, তাদের গুণগত ও বৃত্তিগত গঠন, সদস্যসংখ্যা, আপেক্ষিক গুরুত্ব। মজুরি খাটা মেহনতিদের নতুন নতুন বাহিনী, বা এমন বাহিনী যাতে অতীতে লোক ছিল অল্প, তারা দ্রুত বেড়ে উঠল। দেখা দিল মজুরি খাটা মেহনতিদের এমন সব গ্রুপ যারা কোন শ্রেণীতে পড়ে তা নির্ধারণ করা যথেষ্ট শক্ত।

'প্রলেতারীয়তাচ্যুতি' তত্ত্ব সমর্থন করতে গিয়ে মার্কসবাদবিরোধীরা 'শ্রমিক শ্রেণী' কথাটার অর্থই বিকৃত করে। শ্রমিক বলতে তারা বোঝায় হয় দৈহিক

শ্রমের মজুর নয় কেবল শিল্প শ্রমিক। সেটা ঠিক নয়। শ্রমিক শ্রেণীর সংজ্ঞায় প্রধান কথা হল সামাজিক উৎপাদনের ব্যবস্থায় উৎপাদক শ্রেণী হিশেবে তার স্থান। শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তারা, যাদের শ্রমে সৃষ্ট বৈষয়িক উৎপাদনে বাড়তি মূল্য অথবা অন্য শ্রমিকদের দ্বারা সৃষ্ট বাড়তি মূল্যের একাংশ আত্মসাৎ করার সুযোগ পায় নিয়োগকর্তারা।

উৎপাদনের ক্ষেত্রটা যখন ক্রমেই বেশি করে জড়িয়ে যায় সঞ্চালন আর সার্বিসিঙের ক্ষেত্রদুটোর সঙ্গে, তখন শ্রমিক শ্রেণীর সীমা প্রসারিত হতে থাকে। শিল্প ও কৃষি শ্রমিকের সঙ্গে সঙ্গে তাতে এসে পড়ে সঞ্চালন ও সার্বিস ক্ষেত্রের চাকুরিজীবী কর্মীদের মূল অংশটাও।

পালনীয় কর্মের জটিলতা আর নৈপুণ্যের মানের দিক থেকে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির প্রলেতারিয়েতের কয়েকটা স্তর আলাদা করা যায়: সুদক্ষ শ্রমিক; অর্ধদক্ষ আর সীমিত বিশেষজ্ঞতার শ্রমিক; অদক্ষ শ্রমিক। এই স্তরগুলি নানা লক্ষণে পৃথক। পার্থক্যটা সর্বাগ্রে শ্রমের চরিত্রে। আগে যেখানে শ্রমিকেরা লিপ্ত থাকত প্রধানত বিভিন্ন ধরনের কায়িক শ্রমে, বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লব যত বিকাশ পাচ্ছে, ততই সেখানে শ্রমিকদের কাছে দাবি করা হচ্ছে বেশি করে মানসিক প্রয়াস।

উৎপাদনী শক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কায়িক শ্রমের চরিত্রটাই বদলে যাচ্ছে। অনেক ধরনের কায়িক শ্রম পেশীশক্তি ব্যয়ের চেয়ে স্নায়বিক চাপের সঙ্গে বেশি

জড়িত। জটিল স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার যন্ত্রী, মেরামতকর্মী, অ্যাডজাস্টার, নিয়ন্ত্রকদের সংখ্যা বাড়ছে।

শিল্প শ্রমিকদের বর্গ বিভাগে কেবল শ্রমের চরিত্র আর নৈপুণ্যে নয়, পার্থক্য দেখা যায় জীবনযাত্রার ধরন, শ্রেণী চেতনার মানেও। এই পার্থক্য অবলম্বন করে পশ্চিমী সমাজবিদ্যায় এমন কতকগুলি ধারণা দেখা দিয়েছে যাতে উন্নত দেশগুলিতে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী ঐক্য এবং বর্তমান কালে তার বৈপ্লবিক ভূমিকা অস্বীকৃত।

যেমন ষাটের দশকে পশ্চিমী দেশগুলিতে চালু হয় 'নতুন শ্রমিক শ্রেণীর' ধারণা। তার প্রবক্তারা প্রধান মন দেয় শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যে নয়, পুরনো, চিরাচরিত স্তর আর উৎপাদনের অগ্রণী শাখাগুলির (রসায়ন, বিমান, ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদি) সঙ্গে জড়িত স্তরাদির পার্থক্যের ওপর। এই নতুন শাখাগুলির উচ্চশিক্ষিত, উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদেরকেই ('নতুন শ্রমিক শ্রেণী') তারা মনে করেছিল মেহনতিদের সবচেয়ে বৈপ্লবিক বাহিনী যারা সমাজের আমূল পুনর্গঠনে সক্ষম।

বাস্তব জীবনে দেখা গেল যে তাদের ভুল হয়েছিল। ষাটের দশকের শেষের শ্রেণী অভিধানে 'নতুন শ্রমিক শ্রেণী' চলে 'পুরনো শ্রমিক শ্রেণীর' মতোই, একই দাবি তোলে।

তবে ষাটের দশক থেকে শুরু করে ক্রমেই স্বতঃস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে বর্তমান শ্রমিক শ্রেণী বিভিন্ন যেসব সামাজিক গ্রুপ নিয়ে গড়ে উঠেছে, তাদের শ্রেণী বিকাশ চলে একই

সঙ্গে নয়। চেতনা, সংগঠনশীলতা, রাজনৈতিক সক্রিয়তার মানে প্রলেতারিয়েতের পুরনো বাহিনীগুলির সঙ্গে প্রায়ই তফাৎ থেকে যায় নতুন স্তরের।

সীমান্তবর্তী এবং মধ্যবর্তী গ্রুপ থেকে লোক আসায় শ্রমিক শ্রেণীর চেতনা ও আচরণে বিজাতীয় উপাদান সঞ্চারিত হয়।

মধ্যবর্তী স্তর হল এমন সব সামাজিক গ্রুপ, সমাজের কাঠামোয় যাদের একটা বিশেষ স্থান আছে, কিন্তু সেটা মৌল শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। মধ্য স্তর সমগোত্রীয় নয়। যেসব গ্রুপ নিয়ে তা গঠিত, সামাজিক অবস্থার দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। যেমন ক্ষুদে শোষক, তেমনি শোষিতও থাকে তাদের ভেতর, এমন লোক যাদের মোটা আয়, আবার তারাও যাদের রোজগার গড়পড়তা শ্রমিকের চেয়েও কম। আছে তাতে এমন গ্রুপ যারা অচল হয়ে পড়া, প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত, ('পুরনো মধ্য স্তর'), আবার এমন লোক যারা বিজ্ঞান, পরিচালনা, উৎপাদনের ক্ষেত্রে নবতম সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ('নতুন মধ্য স্তর')।

'পুরনো মধ্য স্তর' হল গ্রাম ও শহরের ক্ষুদে বুর্জোয়া, স্বাধীন পেশার লোক। 'নতুন মধ্য স্তর' প্রধানত মধ্য স্তরের কর্মচারী, ম্যানেজারদের একাংশ, বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত।

মধ্য স্তরগুলিকে একই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত হবার কথা নয়। কিন্তু কতকগুলি দিক

থেকে তাদের মধ্যে একটা মিলও আছে — বৈরগর্ভ সমাজে মৌল শ্রেণীগুলির সঙ্গে সম্পর্কে তাদের মধ্যবর্তী অবস্থা সবার পক্ষেই সাধারণ। এইখানেই বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণী স্বার্থের দ্বৈধ। ক্ষুদে মালিকের মধ্যে মেহনতি আর শোষকের 'সহাবস্থান'। সাধারণ ম্যানেজার একই সঙ্গে পুঁজিপতির অধীনে বেতনভোগী কর্মচারী, আবার পরিচালনার পুঁজিতান্ত্রিক, শোষক কাজকর্মের নির্বাহক।

বিশেষ করে চিহ্নিত করা যায় প্রান্তবর্তী সামাজিক গ্রুপগুলিকে, এদের মধ্যে একই সঙ্গে থাকে একাধিক শ্রেণীর লক্ষণ। এদের মধ্যে পড়ে স্বাধীন কারুজীবী, আবার এমন শ্রমিক যার একখণ্ড জমি আছে, শিল্পে মজুরি খাটা শ্রমিক আর জমিতে কৃষকের কাজ দুই-ই চালায়।

যা দেখানো হল, বর্তমান পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণী কাঠামো বলতে বোঝায় শ্রেণী, শ্রেণীর ভেতরকার স্তর আর শ্রেণীগুলির মধ্যবর্তী গ্রুপ। তবে অন্যান্য সামাজিক স্তর আর গ্রুপও থাকে সমাজে যারা পেশা, জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য লক্ষণে পৃথক। এইসব গ্রুপের বিভিন্ন অবস্থান আর তাদের সম্পর্ক দিয়ে গড়ে ওঠে সামাজিক কাঠামো। সমাজের সম্পর্কাদি বর্ণনায় শ্রেণী কাঠামোকেই মৌল বলে গণ্য করে মার্কসবাদ। কিন্তু সেই সঙ্গে যেসব সামাজিক সম্প্রদায় শ্রেণীর দিক থেকে একগোত্রীয় নয়, অথচ বর্তমান পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে একটা বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ

করে, সেগুলিরও বিশেষ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

যেসব দেশের কৃষিতে পুঁজিতন্ত্র যথেষ্ট উঁচু মাথায় ওঠে নি, সেখানে কৃষকেরা ন্যূনাধিক সমগোত্রীয় সামাজিক-শ্রেণীগত গ্রুপ। কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ যতই চলতে থাকে এবং গভীর হয়, ততই অমোঘ হয়ে ওঠে পুঁজিতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ক্রিয়া। ক্ষুদে উৎপাদকেরা দলে দলে ধ্বংস পেয়ে পরিণত হয় প্রলেতারিয়েতে। মুষ্টিমেয় পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোক্তারা ধনী হয়ে ওঠে। বেড়ে ওঠে অর্থনৈতিক অসাম্য, কৃষিজীবীদের স্তরভেদ।

উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের কৃষিতে টেকনিকাল বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলছে বড়ো বড়ো উদ্যোক্তাদের হাতে উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রীভবন। কৃষি উৎপাদনে একচেটিয়ার সরাসরি প্রবেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেইসঙ্গে বেড়ে চলছে কৃষি শ্রমজীবীদের শোষণ ও তাদের শ্রমের মূল্যহ্রাস। লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে ও মাঝারি চাষির এখন আর কৃষিজ আয়ে কুলছে না, মজুরি খাটতে বাধ্য হচ্ছে তারা, প্রায়ই উৎপাদনের অকৃষি শাখায় (বিশেষ করে শহরের উপকণ্ঠে এবং শিল্পাঞ্চলের কাছে)।

কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীগত স্তরভেদ ঘটলেও নিজের অথবা খাজনায় নেওয়া জমিতে চাষাবাদ করা সুপ্রসর একটা সামাজিক স্তর হিশেবে কৃষক সম্প্রদায়ের অস্তিত্বে সন্দেহ নেই। শ্রমজীবী কৃষকদের সুপ্রসর এই স্তরটা রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া কৃষি পলিসির বিরোধিতা করছে। শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে একত্র ক্রিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে তারা।

কর্মচারীরা শ্রেণী নয়, শারীরিক নয়, মানসিক শ্রমে লিপ্ত একটা আনুষ্ঠানিক-আইনি বর্গ, যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন পায়। বৃত্তির প্রকৃতি অনুসারে তারা কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত: প্রশাসনিক-পরিচালক কর্মনির্বাহী, ইঞ্জিনিয়ার-টেকনিশিয়ান ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ, দোকান কর্মচারী, কেরানি, ইত্যাদি। কর্মচারীর পেশা বিস্তৃতি লাভ করে পরিপক্ক শিল্প পুঁজিতন্ত্রের পর্যায়ে, অর্থাৎ গত শতকের শেষে। কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য হয় পরিবহণ, যোগাযোগ, বাণিজ্য ও ক্রেডিটের বিকাশে, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসারে, সার্বিস ব্যবস্থার বৃদ্ধিতে।

প্রথম দিকে মজুরি খাটা অন্যান্য সামাজিক স্তরের তুলনায় কর্মচারীরা ছিল কিছুটা সুবিধাভোগী অবস্থায়। পুঁজিতন্ত্র বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীরা ক্রমেই হয়ে ওঠে সংখ্যাবহুল ও স্তরবিভক্ত। বর্তমানে কর্মচারীদের মধ্যে মেরুপ্রান্তিকতার প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কর্মচারীদের মূলাংশটা ক্রমশ তাদের বিশেষ সুবিধা হারাচ্ছে এবং শ্রমের চরিত্র, বেতনের পরিমাণ, শ্রমের বাজারে অবস্থার দিক থেকে ক্রমেই শ্রমিক শ্রেণীর কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। কর্মচারীদের এই অংশটা কার্যত পরিচালনায় কোনো অংশ নেয় না।

পক্ষান্তরে কর্মচারীদের ওপরমহল কার্যত মিশে গেছে বুর্জোয়ার সঙ্গে। তৃতীয় অংশটা আছে অন্তর্বর্তী অবস্থানে, তারা মধ্য স্তর।

বুদ্ধিজীবীরা হল বিভিন্ন শ্রেণীর অংশবিশেষ নিয়ে একটা সামাজিক স্তর, যেন সামাজিক-শ্রেণীগত

কাঠামোয় একটা উল্লম্ব ছেদ। কর্মচারীদের আনুষ্ঠানিক-আইনি বর্গ থেকে এদের তফাৎ এই যে এরা একটা বাস্তব সামাজিক গ্রুপ, শ্রমের চরিত্রে তাদের বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান সমাজে বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। সমাজে ক্রিয়াকলাপের সমস্ত ক্ষেত্রে বেড়ে উঠছে তাদের ভূমিকা। সাম্প্রতিক পুঁজিতন্ত্রের পরিস্থিতিতে চলছে বুদ্ধিজীবীর প্রলেতারীয়ভবনের প্রক্রিয়া। তাদের বেশির ভাগ অংশটাই কাজ করে বেতনে। বুদ্ধিজীবীদের নিম্নাংশ পুঁজিতান্ত্রিক শোষণে শোষিত, ক্রমেই তারা কাছিয়ে আসছে শ্রমিক শ্রেণীর দিকে। বুদ্ধিজীবীদের এই অংশের বেতন শ্রমিকদের চেয়ে সামান্যই পৃথক। বুদ্ধিজীবীদের কিছু কিছু জনবহুল বাহিনী, যেমন স্কুল শিক্ষক, প্রায়ই মাইনে পায় দক্ষ শ্রমিকদের চেয়েও কম। বুদ্ধিজীবীদের বর্ধমান অংশ ভোগে বেকারিতে, বিশেষ করে সংকটের সময়।

বুদ্ধিজীবীদের উঁচু মহলটা কার্যত বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্গত।

বুদ্ধিজীবীর প্রলেতারীয়ভবন একটা চূড়ান্ত ব্যাপার নয়। অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী আগের মতোই থেকে যায় অন্তর্বর্তী মধ্য স্তরগুলিতে। বৃহৎ পুঁজির দ্বারা তারা নিজেরাই শোষিত হলেও কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী তাদের নিজেদের সহায়ক ব্যক্তিদেরও শোষণ করে (যেমন, ছোটো ছোটো ব্যক্তিগত ক্লিনিকের মালিক, ওকালতি দপ্তর ইত্যাদি)। বুদ্ধিজীবীদের এই স্তরের অধিকাংশেই বুর্জোয়া রাজনৈতিক মতবাদের প্রাধান্য।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশে বুদ্ধিজীবীদের বিশ্ববীক্ষা মোটেই একরকম নয়। তাদের গণতান্ত্রিক অধিকাংশটা নিজেদের স্বার্থে এবং তাদের শ্রম ও সামাজিক ভূমিকার প্রকৃতির জন্য সংঘাতে আসে পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে, তার অমানবিক লক্ষ্য ও কর্মনীতির সঙ্গে। বর্তমান কালের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা লড়ছে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনী পলিসির বিরুদ্ধে, সামাজিক ন্যায়ের জন্য, একালের গ্রহব্যাপী সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য, শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের জন্য। শ্রমিক শ্রেণী আর গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীদের দাবি ক্রমেই কাছাকাছি এসে যাচ্ছে।

২। উন্নয়নশীল দেশগুলির শ্রেণী বিন্যাস

উন্নয়নশীল দেশ বলতে বোঝা হয় এশিয়া, লাতিন আমেরিকার এমন সব দেশ যারা অতীতে ছিল উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ এবং বাহ্যত স্বাধীন, তবে সাম্রাজ্যবাদী পীড়নের ফলে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে এখন পিছিয়ে আছে। সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো আর সামাজিক অভিমুখের দিক থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে। অবজেকটিভ ক্ষেত্রে তাদের সামনে রয়েছে বিকাশের দুটি পথ: সমাজতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিত খুলে দিয়ে প্রগতিশীল সামাজিক পুনর্গঠন, অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পথ এবং পুঁজিতান্ত্রিক পথ। কোন পথ নেওয়া হবে সেটা খোদ জাতিটিরই নিজস্ব অভ্যন্তরীণ

ব্যাপার। এ নির্বাচন নির্ভর করে সমাজে শ্রেণী শক্তিগুলির অনুপাতের ওপর। এই দেশগুলিকে একটা গ্রুপে ফেলা হয়েছে যে সাধারণ লক্ষণে, সেটা হল উৎপাদনী শক্তির অপেক্ষাকৃত নিম্ন মান, নানাবিধ ব্যবস্থার অর্থনীতি, তাতে পিতৃতান্ত্রিক ও ক্ষুদ্রপণ্য অর্থনীতির উচ্চ আপেক্ষিক গুরুত্ব, অসম্পূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনর্গঠন।

১৯৮০-র দশকের গোড়ায় উন্নয়নশীল দেশগুলি ছিল পৃথিবীর ৬১ শতাংশ ভূভাগ আর দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী নিয়ে।

কিন্তু দীর্ঘকালীন ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কর্তৃক এসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমবল শোষণের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে এইসব দেশের শিল্পোৎপাদন বিশ্বের মাত্র ৭ শতাংশ। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে এখনো বেরিয়ে আসতে পারে নি। বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক বাজারে তারা আপাতত অসম অধিকারভোগী শরিক, তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায়ই উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির একচেটিয়াগুলির চাহিদার মুখাপেক্ষী। অসম বিনিময়, প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠন, বৈদেশিক ঋণের চড়া সুদ আর পরিমাণের ফলে পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তাদের বানচাল হয়ে যাচ্ছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষীণ অর্থনৈতিক বিকাশ, আর অর্থনীতিতে একাধিক ব্যবস্থার অস্তিত্বের ফলে দেখা দেয় তাদের শ্রেণী বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য। এই

প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অনেক উন্নয়নশীল দেশে শ্রেণীর রূপলাভ এখনো সম্পূর্ণ হয় নি।

বর্তমান কালে উন্নয়নশীল দেশের **শ্রমিক শ্রেণী** দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শিল্পোৎপাদন ও রাজনৈতিক শ্রেণী চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংহত হচ্ছে। শ্রমজীবী জনসমষ্টির মধ্যে এখনও তা সংখ্যালঘিষ্ঠ। তাদের বড়ো অংশটা হল কৃষি প্রলেতারিয়েত। শ্রেণী হিশেবে প্রলেতারিয়েতের ঐক্য এবং আত্মচেতনার বিকাশ এইসব দেশে ব্যাহত হয় নানা কারণে। সর্বাগ্রে বলা উচিত যে শিল্পোৎপাদনের যে কাঠামো ঐতিহাসিকভাবে গড়ে উঠেছে তার ফলে শিল্প শ্রমিকদের বড়ো একটা অংশ ছোটো ছোটো উদ্যোগে ছড়ানো। শ্রমিক শ্রেণীর সারিতে অবিরাম কৃষক ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়া লোকেদের যোগদান, সামন্ততান্ত্রিক ও কৌলিক-উপজাতীয় ঐতিহ্যের জের, শ্রমিকদের অস্থিতিশীলতা ও স্থানান্তরে গমন, ব্যাপক নিরক্ষরতা ইত্যাদির ফলে প্রলেতারিয়েতের সংগঠনশীলতা, ঐক্য ও ভাবাদর্শীয় পরিপক্কতার বিকাশ কঠিন হয়, সহজ হয় শ্রমিকদের মধ্যে পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শের অনুপ্রবেশ।

যা বলা হল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারে আফ্রিকার নবীন শ্রমিক শ্রেণী। তাদের মধ্যে প্রায়ই থাকে ঐতিহ্যক্রমে পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন উপজাতি ও কৌলিক গ্রুপের লোক, নানান ধর্ম আর তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী, বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপের মানুষ। 'উপজাতির লোককে' 'শ্রেণীর লোকে' পরিণত হতে হলে বেশ সময় লাগে। বুর্জোয়া কর্তৃক (তাও জাতীয়

বুর্জোয়ার চেয়ে বেশির ভাগ উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের বুর্জোয়া) শোষিত প্রলেতারিয়েত পুঁজিতন্ত্রমুখী দেশগুলিতে 'নিজেরা শ্রেণী' হয়ে ওঠে কেবল ক্রমশ এবং স্বতঃস্ফূর্ত ধারায়।

আফ্রিকান প্রলেতারিয়েত বেশির ভাগ এখনো 'প্রথম পুরুষের' শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত। তাই তারা 'নিজস্ব জোতের' কৃষক মোহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, সেটা ছাড়তে পারে না। তাদের এই দিকটা কাজে লাগায় বুর্জোয়ারা। শ্রমিকদের মধ্যে নিজেদের সামাজিক খুঁটি গাড়ার জন্য উদ্যোক্তারা প্রায়ই দক্ষ শ্রমিকদের ঋণ দেয় নিজের 'কারবার' গুছানোর জন্য, ফাঁকা সময়টায় সেখানে সে সপরিবারে, আত্মীয়স্বজন নিয়ে, কখনো কখনো বাইরে থেকে লোক এনেও খাটে। এক্ষেত্রে এই শ্রমিকেরা হল অর্ধেক প্রলেতারিয়েত, অর্ধেক পেটি বুর্জোয়া।

পুঁজিতন্ত্রমুখী আফ্রিকান দেশগুলির মেহনতি প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক জাগরণ সেখানে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির উদয় ও ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার ওপর দণ্ডায়মানা বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পার্টি ও সংগঠনাদির ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত।

সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণীর কথা ধরলে, তারা রূপ নিচ্ছে বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক শাসনের পরিস্থিতিতে। বৈপ্লবিক অগ্রণী পার্টি এখানে গড়ে ওঠে প্রায়ই খোদ অগ্রণী শ্রেণীটির আগেই। তাই

স্থানীয় শ্রমিক শ্রেণী রূপলাভ করেই হয়ে উঠতে পারে ঐতিহাসিক পুনর্গঠনের সক্রিয় শক্তি, 'নিজেদের জন্য শ্রেণী।'

উন্নয়নশীল দেশে শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, শিল্প প্রলেতারিয়েত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে ট্রেড ইউনিয়নের মতো শ্রমিক সংগঠন, বৃদ্ধি পায় সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রভাব।

প্রলেতারিয়েতের শক্তি, উন্নয়নশীল দেশের সমাজজীবনে এবং জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় তার ভূমিকা সরাসরি নির্ভর করে কৃষকদের সঙ্গে সে কতটা জোট বাঁধতে পারল তার ওপর। **কৃষক সম্প্রদায়** প্রলেতারিয়েতের প্রধান সহযোগী। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তারা অধিবাসীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, বৈপ্লবিক সম্ভাবনা তাদের প্রচুর। উন্নয়নশীল দেশে শ্রেণী সংগ্রামের ফলাফল এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভাগ্যের পক্ষে তাদের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সেইসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে উন্নয়নশীল দেশের কৃষকেরা ভূমিস্বল্পতা, উৎপাদনের আদিম পদ্ধতি, টেকনিকের অভাবে পীড়িত। **জমিদার** এবং অন্যান্য ধরনের ভূস্বামী, **কুসীদজীবী**, বিদেশী কোম্পানির নিষ্ঠুর শোষণে তারা জর্জরিত। যেমন, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে প্রায় ৬০ শতাংশ কৃষকের নিজস্ব জমি নেই, গলা-কাটা শর্তে জমিদারদের কাছ থেকে জমি ইজারা নিতে বাধ্য হয় তারা।

যেমন শিল্পে, তেমনি কৃষিতেও বেকারির সমস্যা

অত্যন্ত তীব্র। সেইজন্যই শহরের দিকে শ্রমশক্তির স্রোত এত প্রবল।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে থাকে **খাজনাভোগী সামন্ত** আর **কুসীদজীবীদের পরগাছা স্তর**, বিপুল জাতীয় সম্পদ আত্মসাৎ ক'রে তারা গ্রামের মেহনতিদের নিক্ষেপ করে নিরন্তর অভাব-অনটন আর নিঃস্বতায়। সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক উচ্ছেদে, কৃষি সংস্কার সাধনে, বিদেশী একচেটিয়াদের বিতাড়নে আর গণতান্ত্রিক সমাজ জীবনে কৃষকেরা একান্ত আগ্রহী।

পুঁজিতন্ত্রমুখী কোনো কোনো উন্নয়নশীল দেশে কৃষক সম্প্রদায়ে দ্রুত ভাঙন ঘটছে, বেড়ে উঠছে লুম্পেন প্রলেতারিয়েত। মজুরি খাটা শ্রমিকে এরা পরিণত হচ্ছে না, কেননা জাতীয় পুঁজি দুর্বল, সর্বাগ্রে তা বাণিজ্যে নিয়োজিত, তাছাড়া বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড বেড়ে উঠেছে জ্ঞান ও দক্ষতার চাহিদা যা এদের নেই। দৈবাৎ পাবার মতো কোনো কাজ খুঁজে হতভাগ্য জীবন কাটায়। অবশ্য বলা দরকার যে উন্নয়নশীল দেশটির সামাজিক অভিমুখ কোন দিকে তার ওপরেই নির্ভর করে লুম্পেন প্রলেতারিয়েতের ভাগ্য। বুর্জোয়া পথে কৃষক সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটে ও বৃদ্ধি পায়, বেকারি বাড়ে, ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায় শ্রেণীচ্যুতি। বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা বোঝে যে এই সমস্যা সমাধানের আসল উপায় হল কৃষক ও কারুজীবীদের উৎপাদনী সমবায়।

সংখ্যাবহুল হলেও কৃষকেরা বৈপ্লবিক প্রগতির প্রধান, চালিকা শক্তির ভূমিকা নিতে পারে না। তাদের

স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদকে সংগঠিত, লক্ষ্যনিষ্ঠ শোষণ-বিরোধী সংগ্রামের খাতে চালাতে পারে কেবল দানা বেঁধে ওঠা শ্রমিক শ্রেণী।

পুঁজিতন্ত্রমুখী দেশগুলির বৈশিষ্ট্য যেখানে সামাজিক স্তরভেদের প্রখরতা, গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী বিরোধের তীব্রতা এবং তার ভিত্তিতে শ্রেণীচ্যুতি ও নিঃস্বীভবনের প্রাধান্য, সেখানে সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলিতে জমি বেঁটে দেওয়া হয় কৃষকদের, নিঃস্বতা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এখানে গ্রাম গোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত গঠনকে আমূল কৃষি পুনর্গঠনের সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি হিশেবে, যৌথ নীতিতে নানা ধরনের কৃষি উদ্যোগ গড়ার জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা হয়।

যেখানে সমাজতন্ত্রমুখিতা কার্যে পরিণত করায় নেতৃত্ব নেয় অগ্রণী পার্টি, সেখানে গ্রামাঞ্চলে অনুসৃত হয় অনেক সুনির্দিষ্ট শ্রেণী কর্মনীতি: উপজাতীয় ও গ্রাম্য মোড়ল, জোতদার, আড়তদার, কুসীদজীবীদের অত্যাচার থেকে কৃষক সাধারণের মুক্তি। এ কর্তব্য সাধনের পথ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু তার মূলকথাটা একটাই: শ্রেণী হিশেবে কৃষকদের সংহতি, দরিদ্র স্তরের ওপর নির্ভর করে মেহনতি ক্ষমতার স্থানীয় সংস্থা স্থাপন, উৎপাদনী শক্তির উন্নতি আর গ্রামাঞ্চলে উৎপাদনী সম্পর্কের আমূল পরিবর্তনের সামাজিক রূপ হিশেবে সমবায় ও রাষ্ট্রীয় খামার গঠন। এই ধরনের খামার হয়ে দাঁড়ায় গ্রামাঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণীর নির্ভরস্থল। এক্ষেত্রে যে আমূল

পুনর্গঠন চলে, তাতে উন্নয়নশীল দেশগুলির সবচেয়ে জনবহুল ও হতভাগ্য অংশটার পক্ষে যুগ যুগের ঘুম থেকে জেগে উঠতে সাহায্য হয়।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে একটা বৃহৎ ভূমিকা নেয় **দেশানুরাগী, গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী,** তথা ছাত্রসম্প্রদায়। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বৃহদংশই সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতায় অনুপ্রাণিত। এদের মধ্যে থেকে প্রায়ই এসেছেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নায়ক ও ভাবপ্রবক্তারা। বিশ্ব সমাজতন্ত্রের সাফল্য, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল ও সাংস্কৃতিক প্রস্ফুরণে বুদ্ধিজীবীদের সেই স্তরটা সবিশেষ আলোড়িত, যারা জনসাধারণের কাছাকাছি।

প্রলেতারিয়েত যেখানে এখনো দুর্বল, সমাজজীবনে প্রধান ভূমিকা এখনো অর্জন করতে পারে নি, সেখানে বুদ্ধিজীবীরা প্রায়ই আবির্ভূত হয় প্রগতিশীল সামাজিক বিকাশের পরিচালক শক্তি হিশেবে, প্রকাশ করে কৃষক, শহুরে পেটি বুর্জোয়া এবং অন্যান্য মেহনতী স্তরের স্বার্থ। বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে স্তরভেদও প্রগাঢ় হচ্ছে। তাদের দেশানুরাগী প্রগতিশীল অংশটা ক্রমেই চলে আসছে রূপায়মান শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের সহযোগীদের অবস্থানে। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিতে নিজেদের জ্ঞান ও সামর্থ্য নিবেদনই নিজেদের কর্তব্য বলে গণ্য করে এই বুদ্ধিজীবীরা।

বলাই বাহুল্য, উন্নয়নশীল দেশের বুদ্ধিজীবীরা তাদের সংবিন্যাস ও শ্রেণীমুখিতার দিক থেকে

সমগোত্রীয় নয়। বুদ্ধিজীবীদের একাংশ নেয় প্রতিক্রিয়াশীল, পেটি-বুর্জোয়া অবস্থান। ভুয়া সমাজতান্ত্রিক বুলি, বাগাড়ম্বরী ধ্বনি আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা রাজনীতির দিক দিয়ে অনভিজ্ঞ আর শ্রেণীচ্যুত লোকেদের সপক্ষে টানার চেষ্টা করে। বুদ্ধিজীবীদের এই অংশটা প্রায়ই আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ার সঙ্গে জুড়ে যায়।

শেষত, উন্নয়নশীল দেশে কিছু বুদ্ধিজীবী রাজনীতি থেকে সরে থাকতে চায়। তারা নিজেদের সংকীর্ণ পেশাগত কাজেই নিমগ্ন থাকতে সচেষ্ট। নিজেদের তারা এই মোহে সান্ত্বনা দেয় যে তারা শ্রেণী সংগ্রামের বাইরে, আছে সংগ্রামরত শ্রেণীগুলি থেকে আলাদা, 'মাঝামাঝি' এক ধরনের নিরপেক্ষ মণ্ডলের কোথাও। আসলে তারা পরিণত হয় নীতিহীন কূপমণ্ডুকে, প্রায়ই চক্রান্ত আর বিশ্বাসঘাতা মারফত প্রতিবিপ্লবের জালে জড়িয়ে পড়তে দেয় নিজেদের।

কেবল দেশানুরাগী বুদ্ধিজীবীরাই নিজেদের জনগণের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত থাকায় প্রকাশ করে সর্বাগ্রে মেহনতি হিশেবে ক্ষুদে উৎপাদকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা। এক্ষেত্রে তারা আসে জাতীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে ভাবাদর্শীয় দ্বন্দ্বে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশের শ্রেণী সংগ্রামে এটা একটা মূলদ্বন্দ্ব। এখান থেকেই শুরু হয় পূর্বতন বৈপ্লবিক প্রেরণা হারানো জাতীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে দেশানুরাগী বুদ্ধিজীবীর ক্রমবর্ধমান বিচ্ছেদ।

বলা বাহুল্য, নিজস্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অপ্রতুলতা, বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শ্রেণীভেদের ক্ষীণ প্রকাশ, বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা ও সামাজিক প্রভাবের অপেক্ষাকৃত দ্রুত বৃদ্ধির কারণে তারা পেটি-বুর্জোয়া স্বতঃস্ফূর্তির কবলিত হয়। প্রায়ই তাদের মধ্যে দেখা যায় দৃঢ় সংকল্পের অভাব, দোদুল্যমানতা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, শ্রেণী সংগ্রামে সঙ্গতিহীনতা। তাই ভাবাদর্শীয় অবস্থান নিয়ে, শ্রমিক শ্রেণীর মৌল স্বার্থ প্রকাশ করে এবং তাদের মধ্যে জ্ঞান, তত্ত্ব, ভাবাদর্শ এনে দিতে গিয়ে বৈপ্লবিক বুদ্ধিজীবীরা তাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের কাছ থেকে শেখে রাজনৈতিক অটলতা, ধৈর্য, যৌথতার নীতি।

উন্নয়নশীল দেশগুলির সামাজিক কাঠামোয় একটা বড়ো জায়গা পেটি বুর্জোয়ার। একসারি দেশের অভিজ্ঞতায় যা দেখা গেছে, জাতীয় ফ্রন্টে তারা গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করতে পারে। পেটি বুর্জোয়া ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে জড়িত। সেইসঙ্গে সাধারণত নিজেরাও তারা সরাসরি শ্রম প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়, পীড়িত হয় সাম্রাজ্যবাদী শোষণে আর বেশি উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে বৃহৎ জাতীয় বুর্জোয়ার জুলুমেও।

প্রকৃতিগতভাবেই পেটি বুর্জোয়ার সামাজিক অবস্থান খুবই স্ববিরোধী। একদিকে সে হল উৎপাদনী উপায়ের মালিক, অন্যদিকে শ্রমে তার ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ বন্ধ হয় নি। তাই পেটি বুর্জোয়া বৈপ্লবিক শক্তির পক্ষ নিতে পারে, আবার প্রতিবিপ্লবের শিবিরেও

গিয়ে পড়তে পারে। পেটি বুর্জোয়ার প্রকৃতি ও সামাজিক অভিমুখীনতা উন্নয়নশীল দেশগুলি সমেত সর্বত্র ও সর্বদা একই।

সামাজিক ও সম্পত্তিগত স্তরভেদের প্রক্রিয়া, বুর্জোয়াপন্থী সরকারগুলির পলিসির ফলে এইসব দেশের পেটি বুর্জোয়ার বিকাশে দুটি প্রবণতা দেখা দেয়। একদিকে চলে এই স্তরের সংখ্যাবৃদ্ধি, অন্যদিকে বেড়ে ওঠে তাদের চূর্ণীভবন, শ্রমজীবীতে পরিণতির প্রক্রিয়া। দ্বিতীয় প্রবণতাটা প্রায়ই প্রথমটাকে ছাপিয়ে ওঠে। তাই পেটি বুর্জোয়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধ্বংস পায় এবং উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত শ্রমজীবীদের দল ভারি করে।

সমাজতন্ত্রমুখী রাষ্ট্রগুলি অন্যের শ্রম শোষণ করে না এমন ক্ষুদে উৎপাদকদের, কৃষক, কারুজীবী, খুচরো দোকানদারদের বিবর্তন চালিত করার চেষ্টা করে উৎপাদনী এবং সরবরাহ-বিক্রয়মূলক সমবায়ের খাতে। এতে করে অপরের শ্রম নিয়োগ ও পরগাছাবৃত্তির ঝোঁক থাকে যে পেটি বুর্জোয়াদের তারা বিদেশী কোম্পানি ব্যাংক প্রভৃতির পক্ষ থেকে শোষণের শিকার না হয়ে উৎপাদনের নিজস্ব উপায়ের সাহায্যে খাটার সুযোগ পায়।

উল্লিখিত শ্রেণী ও স্তরগুলি ছাড়াও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় ফ্রন্টে আসতে পারে **জাতীয় বুর্জোয়াও** — তাদের সেইসব গ্রুপ যারা তাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থানের দরুন

উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সমর্থন করতে সক্ষম।

উন্নয়নশীল দেশের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া, নয়া উপনিবেশবাদ আর প্রতিবিপ্লবের ঘাঁটি হল সর্বাগ্রে স্থানীয় **আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া**। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যন্ত্রব্যবস্থার চাবিকাঠিগুলো ঘুরিয়ে তারা স্থানীয় শোষকদের অন্যান্য গ্রুপগুলিকে দলে টানে এবং তাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের যোগাযোগের মধ্যস্থ ধাপ হিশেবে কাজ করে।

৩। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রেণী বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য

সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে শ্রেণী ও শ্রেণী সম্পর্কের চরিত্র নির্ধারিত হয় উৎপাদনী উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা দিয়ে, সুতরাং শ্রেণী, সামাজিক স্তর ও গ্রুপগুলির মধ্যে যে মৌল স্বার্থের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাই দিয়ে। ব্যক্তি মালিকানার উচ্ছেদে সমাজতন্ত্রে বৈরী শ্রেণী, সুতরাং তাদের মধ্যে বৈরবিরোধও অন্তর্ধান করে। যৌথ উৎপাদনী সম্পর্ক দিয়ে নির্ধারিত হয় সমাজজীবনের সমস্ত ক্ষেত্র এবং শ্রেণীদের মধ্যে সমস্ত সম্পর্ক। সমাজতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রেণী মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক। এটা বোধগম্য কেননা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সামাজিক-শ্রেণীগত কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হল বৈরী শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপের অনস্তিত্ব, অন্যের শ্রম যারা আত্মসাৎ করে, তেমন একদল লোক সেখানে নেই। তার মানে

এই নয় যে সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপগুলির মধ্যে সমস্ত বিরোধ অন্তর্ধান করে। লোপ পায় সাধারণভাবে বিরোধ নয়, কেবল সেই বিরোধ যা শত্রুতামূলক, আপোসহীন।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে দুই প্রধান শ্রেণী হল শ্রমিক শ্রেণী আর সমবায়ী কৃষক।

সমাজতন্ত্রে **শ্রমিক শ্রেণী** আর তেমন শ্রেণী নয় যারা উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত এবং পুঁজিপতিদের নিকট নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয়ে বাধ্য। এ শ্রেণী এখন সমগ্র জনগণের সঙ্গে উৎপাদনী উপায়ের মালিক এবং শোষণ থেকে মুক্ত। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর আপেক্ষিক গুরুত্ব ক্রমাগত বাড়ছে। বদলে যাচ্ছে তাদের গুণগত গঠন, সংস্কৃতি ও শিক্ষার মান।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে **কৃষকদের** ঐতিহাসিক ভাগ্যেও আমূল পরিবর্তন ঘটে। বড়ো বড়ো যৌথ খামারে ব্যক্তিগত খোদ খামারগুলির পুনর্গঠনে সূচিত হয় কৃষকদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক, শ্রম, জীবনযাত্রা, সমস্ত জীবনধারাতেই রীতিমতো পরিবর্তন। যৌথীকরণে গ্রাম মুক্ত হয় ধনী চাষির গোলামি, শ্রেণীগত স্তরভেদ, ধ্বংসপ্রাপ্তি থেকে। উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপায়াদির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে কৃষকেরা ক্রমশ পরিণত হচ্ছে এমন শ্রেণীতে যা সমাজতান্ত্রিক সামাজিক মালিকানার সঙ্গে পুরোপুরি জড়িত।

সমাজতান্ত্রিক দেশের সামাজিক কাঠামোয় একটা বড়ো স্থান থাকে **বুদ্ধিজীবীদের**। সমাজতন্ত্রের বিজয়,

শোষক শ্রেণীদের উচ্ছেদের ফলে বুদ্ধিজীবীরা পরিণত হয় এমন একটা সামাজিক স্তরে, যা সমস্ত শ্রমজীবীর চাহিদা মেটায়। বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থ হয়ে দাঁড়ায় শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থ থেকে অবিচ্ছিন্ন।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ঐতিহাসিক অতীত আর অর্থনৈতিক বিকাশের মান অনুসারে তাদের সামাজিক কাঠামোয় পার্থক্য থাকে। তবে সমাজতন্ত্রের পথে যেসব দেশ চলেছে তাদের সামাজিক-শ্রেণীগত কাঠামো পরিবর্তনের মূল প্রবণতা একই দিকে। সর্বত্রই সমাজতন্ত্র নির্মাণের পরিণাম হল শোষক শ্রেণীদের বিলোপ, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও কর্মচারীদের আপেক্ষিক গুরুত্বের যথেষ্ট বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত খোদ খামারি ও কারুজীবীদের সমবায় অর্থনীতিতে পুনর্গঠন। উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে থাকে সামাজিক অংশগুলির সমতা।

উল্লেখ করা দরকার যে সমাজতন্ত্রের বিকাশ ও সম্পূর্ণীকরণের গতিপথে সামাজিক-শ্রেণীগত বিন্যাস যথেষ্ট বদলিয়ে যায়। এই পরিবর্তনের প্রকৃতি অনুধাবন করা যেতে পারে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের দৃষ্টান্ত থেকে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণী কাঠামো পরিবর্তনের শুরুটা **পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের পর্ব**, বৈপ্লবিক পুনর্গঠন পর্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

এই পর্বটা আবশ্যিক কেননা পূর্বতন সমাজগুলি থেকে সমাজতন্ত্রের পার্থক্য হল এই যে সেগুলি পুরনো সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গর্ভেই বেড়ে

উঠেছিল, কিন্তু সমাজতন্ত্র পুঁজিতন্ত্রের গর্ভে দেখা দেয় না। পুঁজিতন্ত্র কেবল সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বৈষয়িক পূর্বশর্ত তৈরি করে তোলে।

খাস সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্যকৃত হয় ক্ষমতা থেকে বুর্জোয়াকে বিতাড়িত করে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব, অর্থাৎ তার ক্ষমতা, রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পর (দ্রষ্টব্য: ষষ্ঠ অধ্যায়)। আর প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পরে পরেই তৎক্ষণাৎ সমাজতন্ত্র নির্মাণ করাও চলে না। সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য, তথা সমাজের শ্রেণী কাঠামো পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন হয় বেশ দীর্ঘকালীন একটা উৎক্রমণ পর্বের, কেননা জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের জন্য সময় দরকার। বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া ব্যবস্থাপনার অভ্যাস জয় করা যায় কেবল দীর্ঘ ও একরোখা সংগ্রামে।

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব হল পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রধান হাতিয়ার। তার কাজগুলি এই: পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্ক দূর করে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপন; ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদনকে বৃহৎ, যৌথ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে পুনর্গঠন; সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির শিল্পায়ন মারফত সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক-টেকনিকাল ভিত্তি গঠন; বহু ব্যবস্থার অর্থনীতি দূর করে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদ স্থাপন; শোষক শ্রেণীদের উচ্ছেদ; কৃষির যৌথীকরণ; সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধন।

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পর্বে শ্রেণী

কাঠামো ও শ্রেণী সম্পর্কের মূল পর্যায়গুলি নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত:

—**প্রথম** পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে প্রলেতারিয়েত হয়ে দাঁড়ায় সমাজের পরিচালক শক্তি। চলতে থাকে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তির জাতীয়করণ, অর্থনীতিতে পুঁজিতান্ত্রিক উপাদানের সংকোচন, শোষক শ্রেণীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্যের উচ্ছেদ। শ্রেণী হিশেবে জমিদার আর পুঁজিপতিরা অন্তর্ধান করে। গ্রামাঞ্চলে মাঝারি চাষির সংখ্যা বাড়ে, গরিব চাষি কমে। শোষকদের উচ্ছেদ হয়, কিন্তু পুরোপুরি নয়: শহরে থেকে যায় ক্ষুদে শিল্পপতি আর ব্যবসায়ী, গ্রামে — ধনী চাষি। আগেকার বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের পাশেই দেখা দেয় নতুন শ্রমিক-কৃষক বুদ্ধিজীবী।

— **দ্বিতীয়** পর্যায়ে সাধিত হয় দেশের শিল্পায়ন, কৃষির সমবায়ীকরণ, সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এর ভিত্তিতেই সমাজতন্ত্রের বিজয় হয় নির্ধারক। এই পুনর্গঠনের ফলে সমাজতন্ত্রের উৎপাদনী সম্পর্কের উপযোগী সামাজিক-শ্রেণীগত কাঠামো দানা বাঁধে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎক্রমণ পর্বের সূত্রপাত হয় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবে (১৯১৭) যা বুর্জোয়া ও জমিদারদের আধিপত্য উৎখাত করে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব স্থাপন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ সাধিত হয় সমাজতন্ত্রের পথাবলম্বী সমস্ত দেশের পক্ষে একই অবজেকটিভ নিয়মের দাবি অনুযায়ী, তবে তার রূপ, পদ্ধতি আর

গতিবেগ প্রভাবিত হয়েছে তার কতকগুলি ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যে।

মূলগত সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল পাঁচটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব: আদিম পিতৃতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে একেবারে সর্বাধুনিক, সমাজতান্ত্রিক পর্যন্ত। তদুপরি এদেশের বহু জাতি তখনো পুঁজিতন্ত্রের পর্যায়ে ওঠে নি, তাদের সমাজতন্ত্রে যেতে হয়েছে পুঁজিতন্ত্রকে পাশ কাটিয়েই।

প্রধান রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্র নির্মাণ করে পুঁজিতান্ত্রিক শত্রু পরিবেষ্টনের পরিস্থিতিতে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র নির্মাণ সর্বোপায়ে বানচাল করার চেষ্টা করে সাম্রাজ্যবাদীরা। সামরিক হস্তক্ষেপ, অর্থনৈতিক অবরোধের আয়োজন করে তারা, সর্বোপায়ে পোষকতা করে দেশের অভ্যন্তরে পুঁজিতান্ত্রিক দলবলের।

সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎক্রমণ পর্বের কর্তব্য পালিত হয় তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে। প্রথম পর্যায়টা (১৯১৭-১৯২০) ছিল প্রধানত অধিকারগ্রাসীদের অধিকারচ্যুতি অর্থাৎ উৎপাদনী উপায়ের ওপর শোষক শ্রেণীদের, পুঁজিপতি জমিদারদের মালিকানার বাধ্যতামূলক উচ্ছেদ। এই সময়টায় বাজেয়াপ্ত করা হয় সমস্ত জমিদারি জমি, জাতীয়করণ হয় সমস্ত ভূমি, ব্যাংক, শিল্প, পরিবহণ, বাণিজ্যের। দেশের অর্থনীতিতে গড়া হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। জমিদার আর বৃহৎ বুর্জোয়াদের শ্রেণী বিলুপ্ত হল।

দ্বিতীয় পর্যায় (১৯২১-১৯২৫) চিহ্নিত

সাম্রাজ্যবাদী ও অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার, ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের মতো পরিস্থিতি গড়ে তোলার আয়োজন দিয়ে।

—**তৃতীয়** পর্যায় (১৯২৬-১৯৩৭) হল **দেশের** সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পর্যায়। তখন পালিত হয় উৎক্রমণ পর্বের গুরুত্বপূর্ণ সব কর্তব্য। এ পর্যায়ের কর্তব্য পালনের ফলে সাধিত হয় দেশের শিল্পায়ন, কৃষির যৌথীকরণ, অর্থনীতিতে বহু ব্যবস্থার অবসান। সমাজতন্ত্রই হয়ে উঠল দেশের প্রায় একমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। শহর ও গ্রামে পুঁজিতান্ত্রিক উপাদান চূড়ান্তরূপে উৎসাদিত হয়। ঘটল সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সোভিয়েত ইউনিয়নে মূলত নির্মিত হল সমাজতন্ত্র, শেষ হল উৎক্রমণ পর্ব।

সমাজতন্ত্রের কর্তব্য **সাধন** করে সোভিয়েত জনগণ ইতিহাসে এই প্রথম সমগ্র মানবজাতির জন্য পেতে দিল নতুন সমাজে উত্তরণের পথ। সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথাবলম্বী সমস্ত জাতি নিজেদের ঐতিহাসিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে ব্যবহার করছে সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা।

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ পর্বের পর শুরু হয় সামাজিক-শ্রেণীগত বিন্যাসের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় **দ্বিতীয় একটি বৃহৎ পর্ব**। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই পর্ব শুরু হয়েছে ৩০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। তার মূলকথা হল সমাজতন্ত্রের সংহতি, বিকশিত সমাজতন্ত্রের পথ খোলা।

এই পর্বে চলে সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত যৌথতার

নীতিতে সামাজিক সম্পর্কের গোটা ব্যবস্থার পুনর্গঠন। সামাজিক-শ্রেণীগত বিন্যাসের মূল উপাদান থাকে আগের মতোই — শ্রমিক শ্রেণী, যৌথখামারি কৃষক আর বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে। তবে শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপগুলির গঠনে বেশ পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন, ৩০-এর দশকের শেষে, সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন সবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়া হল, তখন শ্রমিক শ্রেণী ছিল অধিবাসীদের প্রায় ৩৪, যৌথখামারি কৃষকেরা ৪৫, কর্মচারী (বুদ্ধিজীবী উপস্তর) ১৬·৫ শতাংশ। এদিকে ৮০'র দশকের গোড়ায় শ্রমিক শ্রেণীর ভাগ দাঁড়ায় ৬০-এর বেশি, যৌথখামারি কৃষকদের ১৪'র বেশি আর কর্মচারীদের প্রায় ২৬ শতাংশ।

সামাজিক-শ্রেণীগত কাঠামোয় এই পরিমাণগত পরিবর্তন খুবই নিয়মসঙ্গত এবং তার কারণ আছে। প্রধান কারণ সামাজিক উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতির ক্রমবর্ধমান প্রসার আর গতিবেগ। শিল্পায়নের উচ্চ গতিবেগ, বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের প্রসার, বর্ধিত শিল্পোৎপাদন, কৃষির যন্ত্রায়ণ ও স্বয়ংক্রিয়করণের ভিত্তিতে কৃষি শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক-শ্রেণীগত কাঠামোয় নিয়মসঙ্গত পরিবর্তন ঘটছে। ভবিষ্যতেও শ্রমিক ও মানসিক শ্রমের কর্মীদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে, তবে তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়বে কম গতিবেগে।

সামাজিক-শ্রেণীগত বিন্যাসে রীতিমতো পরিমাণগত

পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক, বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক চেহারা আর জীবনযাত্রাতেও ঘটেছে প্রগাঢ় গুণগত পরিবর্তন। এ প্রক্রিয়ার মূলেও রয়েছে উৎপাদনী শক্তির যথেষ্ট বিকাশ, উৎপাদনে এমন সব জটিল যন্ত্রপাতির নিয়োগ যাতে দরকার হয় উচ্চশিক্ষিত ও তালিমপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের। সমাজতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিদের সামাজিক পলিসি সাহায্য করে তাতে।

সমাজতন্ত্রের সমুন্নয়ন যত পাকা হয়, ততই শ্রমিক ও কৃষকদের কেবল বৃত্তিগত সামর্থ্য নয়, সাধারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানও বেড়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতি, উৎপাদনের স্বয়ংক্রিয়করণ আর যন্ত্রায়ণে শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রমের চরিত্র অনেক বদলে গেছে। এইসব টেকনোলজিতে কাজ করতে হলে দরকার শিক্ষা ও দক্ষতার উচ্চ মান। কৃষি শ্রম ক্রমেই পরিণত হচ্ছে শিল্প শ্রমের প্রকারভেদে, আর শেষেরটা ক্রমেই মানসিক শ্রমে। এই প্রক্রিয়াগুলি থেকে দেখা দিচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা নিয়মসঙ্গতি — সমাজ ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে সামাজিক-শ্রেণীগত পার্থক্য বিলোপ, সামাজিক সমরূপিতার দিকে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণী, সমবায়ী কৃষক, জনগণের বুদ্ধিজীবীরা মৌল স্বার্থ ও লক্ষ্যের মিলে ঐক্যবদ্ধ। তাহলেও এখনো পর্যন্ত তারা বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপ। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্যের মূলকথা হল উৎপাদনের উপায়ের

সঙ্গে তাদের সম্পর্কে পার্থক্য। শ্রমিকদের শ্রম সর্বজনীন, রাষ্ট্রীয় মালিকানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর সমবায়ী কৃষকদের শ্রম সংশ্লিষ্ট দলের, সমবায়ের মালিকানার সঙ্গে (ভূমি বাদ দিয়ে, যা সর্বসাধারণের সম্পত্তি)।

বণ্টনের ক্ষেত্রেও শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে কিছু বিভিন্নতা আছে। শ্রমিক ও কর্মচারীদের থেকে কৃষকদের পারিশ্রমিকের রূপ ও মান এখনো অন্যরকম। যৌথখামারে সেটা নির্ভর করে খামারের আয়ের ওপর। সমবায়ভুক্ত কৃষকদের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল তাদের সহায়ক জোত, কৃষিদ্রব্যের উৎপাদনে তার ভূমিকা এবং কৃষকদের আয়ের পরিমাণে তার প্রভাব কম নয়।

সমাজতন্ত্রে বুদ্ধিজীবী আর অন্যান্য সামাজিক গ্রুপের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বজায় থাকে। সেটা থাকে সামাজিক শ্রম বিভাগে তাদের স্থান, শ্রম সংগঠনে ভূমিকা, শ্রমকর্মের চরিত্র ও মর্মার্থ, সাংস্কৃতিক-টেকনিকাল মানে।

শ্রেণী বৈরের বিলোপ আর ক্রমশ শ্রেণীহীন সমাজের রূপলাভ হল সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের অবজেকটিভ নিয়ম। এইসব বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের কেন্দ্রে থাকে কোন শক্তি? সে শক্তি হল **শ্রমিক শ্রেণী**।

তার কারণ উৎপাদনের সামাজিক প্রণালীতে তার অবস্থান। শ্রমিকেরা থাকে টেকনিকাল প্রগতির অগ্রস্থলে। শিল্পোৎপাদনে নিজেদের জীবন ও শ্রমের পরিস্থিতির দরুন শ্রমিক শ্রেণী হল সমাজতান্ত্রিক

চেতনা, বৈপ্লবিকতা আর যৌথনীতির সবচেয়ে সঙ্গতিশীল বাহক। সমস্ত শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে তারা সবচেয়ে একনিষ্ঠ যোদ্ধা। শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান ভূমিকার আরো একটা কারণ এই যে তারা পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শীয় সংগ্রামে লালিত, ঐক্যবদ্ধ ও পোক্ত। এই সংগ্রামের গতিপথে তারা অর্জন করেছে বৈপ্লবিক শৃংখলা আর সংগঠনশীলতা, প্রলেতারীয় চৈতন্য আর সংস্কৃতি।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক শ্রেণী তার নিরধিকার নিপীড়িত অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করে, হয়ে দাঁড়ায় সমাজের উৎপাদনী শক্তির নির্ধারক ভিত্তির, আধুনিক শিল্পোৎপাদনের কর্তা। তারাই গড়ে অধুনাতন টেকনিক আর টেকনোলজি। শিল্পোৎপাদনের যৌথ সংগঠনে অভূতপূর্ব পরিসরে তারা ঐক্যবদ্ধ। অবিরাম বাড়ছে শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত লোকেদের সংখ্যা, তাদের ভাবাদর্শীয়-রাজনৈতিক পরিপক্কতা, শিক্ষা আর বৃত্তিগত দক্ষতা। শ্রমিকের কাজ ক্রমেই ভরে উঠছে মনন দক্ষতায়। সমাজতন্ত্রের নীতিতে সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকাই প্রধান এবং ক্রমেই তা বেড়ে উঠছে।

এসবে স্পষ্টতই খণ্ডিত হয় বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের এই প্রচার যে বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লব বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণী হ্রাস পাবে এবং ভবিষ্যতে অন্তর্ধান করবে। আসলে বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতিতে শ্রমিক শ্রেণী আদৌ হ্রাস পায়

না, কমে কেবল কায়িক শ্রমে লিপ্ত স্বল্পদক্ষ লোকেদের সংখ্যা। কিন্তু সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী বলতে শুধু এদেরকেই গণ্য করা মারাত্মক ভুল।

শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে এবং তাদের সঙ্গে সহযোগে কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদেরও বিপুল গুণগত বিকাশ ঘটেছে। সমাজতন্ত্রে মানসিক ও কায়িক শ্রমের কর্মীদের মধ্যে গড়ে ওঠে পাকাপোক্ত মৈত্রী। বর্তমানে বুদ্ধিজীবীরা কেবল বিজ্ঞান, শিক্ষা আর সংস্কৃতিতেই নয়, ক্রমেই বেশি করে ভূমিকা নিচ্ছে বৈষয়িক উৎপাদনেও, গোটা সমাজজীবনে। অন্যদিকে আবার লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও যৌথখামারির উৎপাদনী ক্রিয়াকর্মে ক্রমেই বেশি করে বিজড়ন ঘটছে কায়িক আর মানসিক শ্রমের। তাদের অনেকেই র‍্যাশনালাইজার আর উদ্ভাবক, প্রবন্ধ, পুস্তকাদির লেখক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কর্মকর্তা। পেশায় শ্রমিক হলেও যথার্থেই এরা উচ্চ সংস্কৃতিমান মননশীল ব্যক্তি।

শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের নৈকট্যে প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধিজীবীদের 'কৌলিন্য', সমাজতন্ত্রে তাদের বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের নানান ধারণা একান্তই ভিত্তিহীন। বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের পরিস্থিতিতে, সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণীকরণের পর্বে শ্রমিক শ্রেণীর মুখ্য ভূমিকা হ্রাস পায় না, যা দেখাতে চান কিছু কিছু বুর্জোয়া ভাবাদর্শী, বরং পক্ষান্তরে শ্রমিক শ্রেণী আরো বেশি এগিয়ে আসে নতুন সমাজ নির্মাণের নির্ধারক শক্তি হিশেবে। সর্বাগ্রে শ্রমিক শ্রেণীই হল নতুন সামাজিক সম্পর্কের বাহক।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রেণী সংগ্রাম — বৈরগর্ভ ব্যবস্থার বিকাশে চালিকা শক্তি

১। শ্রেণী সম্পর্ক ও শ্রেণী স্বার্থ

শ্রেণী সংগ্রাম কী জিনিস, কী তার উদ্দেশ্য ও মর্মার্থ, বৈরগর্ভ ব্যবস্থার বিকাশে কেন তা চালিকা শক্তি, সেটা বুঝতে হলে সর্বাগ্রে শ্রেণী সম্পর্ক ও শ্রেণী স্বার্থের প্রশ্নটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার।

সমাজের প্রকৃতি অনুসারে তার ভেতরকার সম্পর্ক হতে পারে শ্রেণীহীন, অথবা শ্রেণীমূলক। যেমন আদিম সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সামাজিক শ্রেণী নেই, তাই শ্রেণী সম্পর্কও নেই। ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজেও শ্রেণী বিলুপ্ত হবে। তাই শ্রেণী সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হল এর চরিত্র সাময়িক। তবে যেখানে শ্রেণীঘটিত সম্পর্ক বিদ্যমান, সেখানে তা সামাজিক সম্পর্কের একটা প্রধান

রূপ। তার কারণ এ সম্পর্ক যাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে, সেই শ্রেণীগুলিই হল সামাজিক গঠনের বনিয়াদি উপাদান। এক্ষেত্রে শ্রেণীর চরিত্র এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুসারে শ্রেণী সম্পর্ক হতে পারে দুই রকমের — **বৈরিতামূলক** এবং **অবৈরী**। প্রথম সম্পর্ক দেখা দেয় শত্রুস্থানীয় শ্রেণীগুলির মধ্যে (দাস আর দাসপ্রভু, ভূমিদাস আর সামন্ত, শ্রমিক এবং পুঁজিপতি), দ্বিতীয় সম্পর্কটা থাকে অবৈরী শ্রেণীদের মধ্যে (যেমন সমাজতন্ত্রে শ্রমিক শ্রেণী আর সমবায়ভুক্ত কৃষকদের মধ্যে)।

শ্রেণী সম্পর্কের মূলে থাকে মালিকানার সম্পর্ক, কেননা খোদ শ্রেণীরই উদ্ভব এই মালিকানা নিয়ে। ব্যক্তিগত মালিকানায় দেখা দেয় শ্রেণীগুলির মধ্যে বৈরিতা, সামাজিক মালিকানায় মৈত্রী।

শ্রেণী সম্পর্কের অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে তার ছাপ পড়ে সর্ববিধ সামাজিক সম্পর্কের ওপর। তার কারণ শ্রেণী সম্পর্কটা হল বহুমুখী এবং তা আত্মপ্রকাশ করে বৈষয়িক ও আত্মিক চরিত্রের নানাবিধ সম্পর্কের পুরো একটা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। তদনুসারে শ্রেণী সম্পর্কের মূলগত গঠন দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

অর্থনৈতিক সম্পর্ক — উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানা নিয়ে শ্রেণীগুলির মধ্যে সম্পর্ক এবং তার ওপর নির্ভরশীল উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও পরিভোগের ক্ষেত্রে সম্পর্ক;

রাজনৈতিক সম্পর্ক — রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রেণীগুলির মধ্যে সম্পর্ক;

আইনি সম্পর্ক — আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে শ্রেণীগুলির মধ্যে সম্পর্ক;

নৈতিক সম্পর্ক — নৈতিক আদর্শ পালন নিয়ে শ্রেণীগুলির মধ্যে সম্পর্ক;

নান্দনিক সম্পর্ক — শিল্পীয় মূল্যবোধের প্রবর্তন ও উপভোগের ক্ষেত্রে শ্রেণীগুলির মধ্যে সম্পর্ক।

সামাজিক-শ্রেণীগত কাঠামো যেমন হতে পারে উৎক্রমণমূলক চরিত্রের, তেমনি **উৎক্রমণমূলক শ্রেণী সম্পর্কও** দেখা গেছে। যেমন, আদিম সমাজ থেকে শ্রেণী সমাজে উত্তরণের পর্বে কৌলিক-উপজাতীয় শ্রেণীহীন সম্পর্ক দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে জায়মান শ্রেণী সম্পর্কের পাশাপাশি, জড়াজড়ি করে। পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পর্বে মুমূর্ষু পুঁজিতন্ত্র আর জায়মান সমাজতন্ত্রের মধ্যে সংগ্রাম চলে। এক্ষেত্রে তেমন শ্রেণী সম্পর্ক দেখা দেয়, যার বৈশিষ্ট্য শোষকদের প্রতিরোধ প্রসঙ্গে বলপ্রয়োগ রূপে শ্রেণী সংগ্রাম আর সেইসঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর পরিচালনায় মেহনতিদের জোট।

উৎক্রমণমূলক শ্রেণী সম্পর্কের বিশ্লেষণ থেকে এও দেখা যায় যে নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌল শ্রেণীগুলির মধ্যেই, যেমন কেবল দাস আর দাসপ্রভু, ভূমিদাস আর সামন্ত, শ্রমিক আর পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যেই বৈর সম্পর্ক থাকে তাই নয়। যে শ্রেণীর জায়গায় অন্য শ্রেণী আসছে, তাদের মধ্যেও বৈর সম্পর্ক থাকতে পারে। যেমন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের জায়গায় পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ এসে যখন

মালিকানা ও শোষণের পুরনো প্রথা ধ্বংস করে, সে যুগে বুর্জোয়া ও সামন্ত শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক। তবে ভোলা উচিত না, যে নিজেদের অস্তিত্বের কোনো একটা পর্বে শোষক শ্রেণীরা ঐক্যবদ্ধও হতে পারে। সেটা ঘটতে পারে যেমন রাজনীতি, তেমনি অর্থনীতির ক্ষেত্রেও। যেমন, বেশ কিছু দেশে শোষণের সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি মিশে গেছে বুর্জোয়া পদ্ধতির সঙ্গে। রাজনীতির ক্ষেত্রে জমিদার আর বুর্জোয়ারা প্রায়ই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তাদের সাধারণ শত্রু, মেহনতি জনগণের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য।

শ্রেণীর অস্তিত্বের অর্থনৈতিক শর্ত, সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের অবস্থান দিয়েই নির্ধারিত হয় শ্রেণীর স্বার্থ। **শ্রেণী স্বার্থ** হল উৎপাদনের বিদ্যমান প্রণালী, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে শ্রেণীটির অবজেকটিভ সম্পর্ক, যা তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। শ্রেণী স্বার্থ সর্বদাই থাকে বিদ্যমান উৎপাদন প্রণালী আর রাষ্ট্র ব্যবস্থার রক্ষণ নয় তার উচ্ছেদ করে নতুন প্রগতিশীল ব্যবস্থার প্রবর্তনে নিয়োজিত।

শ্রেণী স্বার্থ নির্ধারিত হয় সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট শ্রেণীটির অবস্থান আর ভূমিকা দিয়ে, প্রলেতারিয়েত যেহেতু উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানা থেকে বঞ্চিত, পুঁজিপতিদের দ্বারা শোষিত, তাই নিজেদের অবজেকটিভ অবস্থার দরুন তারা পুঁজিতন্ত্র উচ্ছেদে আগ্রহী এবং বৈপ্লবিক শ্রেণী। এর সঙ্গেই জড়িত তার শ্রেণী স্বার্থ। পক্ষান্তরে বুর্জোয়ার

শ্রেণী স্বার্থ হল বিদ্যমান যে অবস্থায় তার পক্ষে প্রলেতারিয়েতকে শোষণ সম্ভব হচ্ছে, সেটা টিকিয়ে রাখা, তাই নিজেদের অবজেকটিভ অবস্থার দরুন তারা পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কে সংরক্ষণে আগ্রহী। সমাজতন্ত্রের পূর্ববর্তী সমস্ত ব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য হল বৈরী স্বার্থের বৈপরীত্য।

শ্রেণীর পরিপক্কতা নির্ধারণে বড়ো একটা ভূমিকা নেয় তার বিকাশ আর শ্রেণী স্বার্থ সম্পর্কে তার চেতনার মান।

ইতিহাসের স্রষ্টা এক-একজন ব্যক্তি নয়, সর্বাগ্রে গোটা শ্রেণী। তদুপরি সেটা গড়া হয় নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ অনুযায়ী। তাই সামাজিক সম্পর্কগুলির জটিল বিজড়নের মধ্যে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, তত্ত্ব, নৈতিক, নান্দনিক আদর্শ ইত্যাদির চিত্রবিচিত্র ক্যালিডস্কোপের মধ্যে শ্রেণীদের সত্যকার স্বার্থ আলাদা করে নেওয়া উচিত। সামাজিক ঘটনাদির বিশ্লেষণে শ্রেণীগত অভিগমন সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়া চলছে তার খাঁটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন ও তার অবধারিত শর্ত। শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ইতিহাসের স্রষ্টা সামাজিক শক্তিগুলিকে তুলে ধরা, সামাজিক বিকাশের প্রধান প্রধান প্রবণতা ও পরিপ্রেক্ষিত আবিষ্কার করা সম্ভব।

সমাজের মৌল শ্রেণীগুলির স্বার্থ বিপরীতও হতে পারে, আবার সাধারণও হতে পারে, বিপরীত হল বৈরী শ্রেণীগুলির স্বার্থ, তারা বৈরী সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। এর ফলে সমাজে অবশ্যই দেখা দেয় শ্রেণী

সংগ্রাম, যা এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে শোষণের বিরুদ্ধে চালিত। যা বলা হল তাতে অবশ্য এ কথাটা নাকচ হয় না যে বৈরী শ্রেণীগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে আংশিক বোঝাপড়াও সম্ভব। যেমন শ্রমিকদের ধর্মঘট সংগ্রামের চাপে পুঁজিপতির পক্ষে নতিস্বীকার, যৌথ চুক্তি সম্পাদনে এ শ্রেণীগুলির মধ্যে আপোস ঘটতে পারে।

বৈরগর্ভ সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপের স্বার্থের মধ্যে মিল সম্ভবপর, ফলে তাদের একত্র ক্রিয়াকর্মের সম্ভাবনা থাকে। আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের পরিস্থিতিতে একচেটিয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েত, কৃষক আর শহুরে পেটি বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী আর কর্মচারীদের মূলাংশের মিলিত ক্রিয়াকর্মের বাস্তব সম্ভাবনা বিদ্যমান। এইসব গ্রুপের সঙ্গে জোট বেঁধে সর্বাধিক বৈপ্লবিক, সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী হওয়ায় প্রলেতারিয়েত নেতৃত্বদানে আহূত। উন্নয়নশীল দেশগুলির পরিস্থিতিতেও স্বার্থের সমাপতন দেখা যায়। এর ভিত্তিতে আমলাতান্ত্রিক ও একচেটিয়া বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে, বহুজাতীয় কর্পোরেশনগুলির অর্থনৈতিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে বিভিন্ন সামাজিক স্তরের জোট খুবই হতে পারে।

শ্রেণী সংগ্রামে সামাজিক প্রকৃতির দিক থেকে অতি বিভিন্ন সব শ্রেণীর স্বার্থের সাময়িক মিলও ঘটতে পারে, যখন তাদের সামনে থাকে সাধারণ শত্রু। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সর্বজাতীয় কর্তব্য (যেমন জাতীয়

স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম) হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন একটা মঞ্চ যাতে মিলিত হওয়া সম্ভব মেহনতি জনগণের (শ্রমিক, কৃষক, শহুরে পেটি বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী) এবং জাতীয় বুর্জোয়ার পক্ষেও।

শ্রেণী স্বার্থ হয় মৌল আবার সাময়িক, আংশিক। মালিকানার বিদ্যমান রূপ ও সমাজ-ব্যবস্থাকে হয় শক্তিশালী করা, নয় তার উচ্ছেদ করে সমাজব্যবস্থা বদলের জন্য সংগ্রাম করাই হল **মৌল শ্রেণী স্বার্থ**। যেমন, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে প্রলেতারিয়েত উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানা থেকে বঞ্চিত, শোষিত হয় সে, তাই পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানার, বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদে সে একান্ত আগ্রহী। এই হল তার মৌল শ্রেণী স্বার্থ। পক্ষান্তরে বুর্জোয়া উৎপাদনী উপায়ের মালিক, সে মালিকানা বজায় রাখায়, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চিরন্তন করে তোলায় সে আগ্রহী। প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়ার শ্রেণী স্বার্থ সরাসরি বিপরীত, তার মিটমাট হতে পারে না।

সাময়িক, আংশিক শ্রেণী স্বার্থ দেখা দেয় জীবন ও শ্রেণী সংগ্রামের মূর্ত-নির্দিষ্ট বিশেষ পরিস্থিতিতে। যেমন, একটা বা একসারি উদ্যোগের শ্রমিকেরা লড়তে পারে নিজেদের জীবনযাত্রার পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য। এ সংগ্রামে কোনো কোনো প্রশ্নে শ্রেণীদের পক্ষ থেকে ছাড় দেওয়া, আপোস করা সম্ভব।

সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় নিজেদের অবজেকটিভ অবস্থানের দরুন যেসব শ্রেণীর অবস্থান কাছাকাছি, তাদের প্রধান স্বার্থ মিলে যেতে পারে।

শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের মৌল স্বার্থের মিল থাকায় তাদের সহযোগিতা আর নিজেদের নিপীড়কদের বিরুদ্ধে একত্র ক্রিয়াকর্মের পাকা ভিত্তি গড়ে ওঠে।

শ্রেণীর স্বার্থকে গোটা সমাজের স্বার্থ থেকে তফাৎ করে দেখা উচিত। শ্রেণীর স্বার্থ হল নির্দিষ্ট একদল লোকের স্বার্থ, যে ক্ষেত্রে সমাজের স্বার্থ হল তার অত্যধিকাংশ সদস্যের স্বার্থ। সমাজের স্বার্থ হল সামাজিক অগ্রগতি, উৎপাদনী শক্তি আর উৎপাদনী সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য, সমাজসভ্যদের স্বাধীন বিকাশের নিশ্চিতি। সমাজের স্বার্থ আর শ্রেণীর স্বার্থ সর্বদা মেলে না। যেমন, সমাজের স্বার্থ সামাজিক অগ্রগতিতে বাধা দিতে এবং নিজেদের শ্রেণীগত বিশেষ সুবিধা বজায় রাখতে সচেষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর স্বার্থের বিপরীত।

প্রগতিশীল শ্রেণীদের স্বার্থ আর সমাজের স্বার্থের মধ্যে দেখা দেয় অন্য ধরনের আপেক্ষিকতা। প্রগতিশীল শ্রেণীরা সমাজের ঊর্ধ্বমুখী বিকাশে, সমাজজীবনের পরিপক্ক প্রয়োজন মেটাতে আগ্রহী। তাদের শ্রেণী স্বার্থ সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে ন্যূনাধিক মিলে যায়। সমাজতন্ত্রের বিজয়, শোষক শ্রেণীদের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে সমাজের স্বার্থের সঙ্গে সমস্ত শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপের মৌল স্বার্থের সমাপতন।

উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং তার ভিত্তিতে মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ উচ্ছেদের ফলে দেখা দেয় সর্বজনীন স্বার্থের সঙ্গে এক-একজন কর্মী, উৎপাদনী যৌথ, সামাজিক

গ্রুপ ও শ্রেণীর স্বার্থের ঐক্য। দাসতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে যেখানে বিকাশ এগিয়েছে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত ও বিরোধের মধ্যে দিয়ে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ সেখানে বিকশিত তাদের ঐক্যের ভিত্তিতে, সেটাই তার প্রবল চালিকা শক্তি।

উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা এবং তৎপ্রসূত কমরেডসুলভ সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের সম্পর্ক হল তাদের লক্ষ্য; এবং সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের ক্রিয়াকর্ম সমগোত্রীয়তা উদ্ভবের ভিত্তি। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হল **সমাজের সমস্ত সভ্যের** বৈষয়িক ও আত্মিক চাহিদার যথাসম্ভব পূর্ণাকারে পূরণ, সেটা থেকেই আসে উৎপাদনের সমস্ত সামাজিক উপায়ের সমাধিকারী সহকর্তা হিশেবে তাদের একত্রে উদ্দেশ্যমূলক ও পরিকল্পিত ক্রিয়াকর্মের কার্যকরী প্রেরণা।

সমাজতন্ত্রে সামাজিক স্বার্থ হল সর্বাগ্রে সমাজতান্ত্রিক মালিকানার ভিত্তিতে লোকেদের লক্ষ্যৈক্যের অভিব্যক্তি। সামাজিক উৎপাদনের পরিকল্পিত সংগঠনের মাধ্যমে তা শ্রমবল, ফিনান্স, বৈষয়িক সম্পদের সর্বাধিক ফলপ্রদ সদ্ব্যবহারের সুযোগ দেয়, সর্বাধিক মেটায় সমস্ত মেহনতির গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা।

শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের স্বার্থের ঐক্য মানে এই নয় যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বন্ধু শ্রেণীগুলির নিজ নিজ বিশেষ স্বার্থ থাকবে না, তবে তাদের মধ্যে পার্থক্যের প্রকৃতি বৈরিতামূলক নয়।

এইটে বৈশিষ্ট্যসূচক যে বন্ধুস্থানীয় উভয় শ্রেণীর অতি গুরুত্বপূর্ণ সব স্বার্থ মেটানো হয় একটাকে বাড়িয়ে অন্যটাকে ছোটো করে দেখার ভিত্তিতে নয়। বরং উলটো, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যে নীতি অনুসরণ করে সেটা সমগ্র জনগণের প্রতিনিধি হিশেবে এবং সিদ্ধান্তাদি নেয় ঠিক সর্বজনীন স্বার্থের অবস্থান থেকেই।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ যত বিকশিত হয়, ততই এমন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি গড়ে ওঠে যাতে ব্যাপক মেহনতি জনসাধারণ সামাজিক উৎপাদনে তাদের অবস্থার দিক থেকে ক্রমেই চলে আসে শ্রমিক শ্রেণীর কাছাকাছি। বেড়ে ওঠে তাদের সংগঠনশীলতা, রাজনৈতিক চারিত্র্য, সামাজিক-রাজনৈতিক সক্রিয়তা। শ্রমিক শ্রেণী, সমবায়ী কৃষক আর বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থ ক্রমশ পরিবিকশিত হতে থাকে একই যৌথ স্বার্থে।

২। বৈরগর্ভ সমাজবিকাশের চালিকা শক্তিরূপ শ্রেণী সংগ্রাম

সামাজিক-ঐতিহাসিক বাস্তবতায় যা দেখা যায়, বৈরগর্ভ সমস্ত ব্যবস্থার ইতিহাস হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। শ্রেণী সমাজ উদ্ভবের একেবারে গোড়া থেকেই খাস উৎপাদনটাই স্থাপিত হতে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপ, সম্প্রদায়, শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতার ওপর।

সমাজ শ্রেণীতে ভেঙে যাওয়ার সময় থেকে শোষক আর শোষিতের মধ্যে অবিরাম চলতে থাকে কখনো প্রকাশ্য কখনো প্রচ্ছন্ন কখনো সশস্ত্র কখনো শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম। তা ব্যাপ্ত হয় সমাজজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে—অর্থনীতি, রাজনীতি, ভাবাদর্শে, বৈরগর্ভ সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রেণী সংগ্রাম হল সামাজিক বিকাশের প্রবল চালিকা শক্তি। শোষিত শ্রেণীদের বৈপ্লবিক সংগ্রাম সমাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়, পুরনো অচল হয়ে পড়া সমাজকে ঝেঁটিয়ে সাহায্য করে নতুন প্রগতিশীল সমাজ স্থাপনে।

একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জায়গায় অন্যটার প্রতিষ্ঠা হল বেড়ে-ওঠা উৎপাদনী শক্তি আর পুরনো পেছিয়ে-পড়া উৎপাদনী সম্পর্কের মধ্যে সংঘাত সমাধানের পরিণাম। বৈরী শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজে এ সংঘাত অভিব্যক্ত হয় শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রায়ণে। এক-একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণী সংগ্রাম তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত।

দাসতান্ত্রিক সমাজে নির্মম সংগ্রাম চলে তার মৌল শ্রেণী দাস ও দাসপ্রভুদের মধ্যে, যাদের ভেতরকার বিরোধ ছিল সে সময়কার প্রধান শ্রেণী বিরোধ। দাসেরা অভ্যুত্থিত হয়, হাঙ্গামা বাধায়, যুদ্ধ চালায়, লড়ে পীড়ন আর অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে, 'স্বর্ণ যুগে' ফেরার জন্য, যখন দাসমালিক কেউ ছিল না। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় ছোটো ছোটো স্বাধীন কৃষক আর কারুজীবীরা, দাসত্বের বিরোধিতা করে তারা। দাসেদের, কৃষিজীবী ও কারুজীবী গরিবদের গণ

অভ্যুত্থান ঘটে মিসর, চীন, গ্রীস, রোমে, সমস্ত দাসতান্ত্রিক রাষ্ট্রে।

যেমন বহুযুগ আগে, মোটামুটি খ্রিঃ পূঃ ১৮ শতকের মাঝমাঝি মিসরে একটা বিপুল অভ্যুত্থান ঘটে দাস আর গরিবদের। বিশ্ব ইতিহাসে এইটেই দাসেদের প্রথম অভ্যুত্থান, যা আমরা জানি। এতে মিসরে দাসমালিক সমাজের ভিত্তি নড়ে ওঠে। তার বিবরণ লিখে গেছেন মিসরীয় অমাত্য ইপুভার। আরেকজন মিসরীয় লেখক নেফের্তিও এ সংবাদ দিয়েছেন।

প্রাচীন প্যাপিরাস থেকে আমরা জেনেছি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষিজীবীরা অস্ত্র হাতে উঠে দাঁড়ায় ফারাও, অমাত্য আর ধনীদের বিরুদ্ধে, বেত্রাঘাতে যারা তাদের খাটাত সে প্রভুদের বশ মানতে অস্বীকার করে দাসেরা। অল্প সময়ের মধ্যে সারা দেশ রূপান্তরিত হয়ে যায়; যে গরিবেরা আগে জমি চষত নিজেদের পেশীর শক্তিতে, তারা ষাঁড় বলদ দখল করে লাঙলে জুততে থাকে। সাধারণ কৃষিজীবী, এমনকি দাসেরাও তাদের ন্যাতাকানি ফেলে দিয়ে পরিধান করে মিহি বস্ত্র। দাসীরা গলায় পরে দামি পুঁতির মালা। ক্ষুধার্ত, ছিন্নবস্ত্র তরুণীরা তামার আয়না ব্যবহার করতে শিখল।

কিন্তু উত্থিত গরিব আর দাসেরা নিজেদের বিজয় বুদ্ধিমানের মতো কাজে লাগাতে পারে নি। উৎপীড়কদের ধনসম্পদ তারা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল বটে, কিন্তু দাসপ্রথা নির্মূল করে জুলুম আর শোষণ থেকে মুক্ত নতুন জীবন গড়ার কথা ভাবে নি। অচিরেই পুনর্প্রতিষ্ঠিত হল ফারাও আর

উচ্চবংশীয়দের ক্ষমতা, সবই চলতে লাগল আগের মতো।

দাসেদের অভ্যুত্থান সবচেয়ে তীব্র হয় খ্রিঃ পূঃ ২-১ম শতকে ভূমধ্য সাগরের তীরে: এভন আর ক্লেয়নের নেতৃত্বে সিসিলি দ্বীপে, আরিস্টোনিকের পরিচালনায় এশিয়া মাইনরে, রোমের দাসপ্রভুদের বিরুদ্ধে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাসেদের তিন বছরের যুদ্ধ ইত্যাদি।

তবে দাসেদের বৈপ্লবিক অভিযান সর্বত্রই শেষ হয় অনিবার্য পরাজয়ে কেননা দাসেরা অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল উৎপাদনী সম্পর্কের বাহক না হওয়ায় সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য সুস্পষ্টরূপে বুঝতে, নিজেদের খণ্ডবিখণ্ডতা কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

তাহলেও দাসেদের সংগ্রামের প্রগতিশীল তাৎপর্য ছিল, কেননা তা ক্রমশ দাসতান্ত্রিক ব্যবস্থার খুঁটি নড়বড়ে করে দেয়। উচ্চতর সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের অবজেকটিভ পূর্বশর্ত যখন পেকে উঠল, তখন এই সংগ্রামই শেষ বিচারে সাহায্য করেছে দাসত্বের উচ্ছেদ করে সামন্ততন্ত্রের প্রবর্তনে।

উৎপাদনের সামন্ততান্ত্রিক প্রণালীর বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দাসপ্রভু আর দাসেদের জায়গায় দেখা দিল নতুন মৌল শ্রেণী: সামন্ত-জমিদার আর ভূমিদাস কৃষক। **সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্বের গোটা যুগটা তাদের আপোসহীন নির্মম শ্রেণী সংগ্রামে পরিপূর্ণ।** কৃষকেরা লড়েছে জমির জন্য, ভূমিদাসত্বমূলক অধীনতা থেকে মুক্তির জন্য। এ সংগ্রাম প্রায়ই পরিণত হয়েছে তুমুল কৃষক সমরে। এই

ধরনের ছিল ১৪শ শতকে ফরাসি কৃষকদের যুদ্ধ — জাকেরিয়া; ১৪শ শতকের শেষে ওয়োট টাইলারের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে কৃষক অভ্যুত্থান; ১৬শ শতকের গোড়ায় টমাস মিউনৎসারের পরিচালনায় জার্মানিতে কৃষক সমর। রাশিয়ায় কৃষকদের বিপুল অভিযান হল ইভান বলোৎনিকভের নেতৃত্বে কৃষক অভ্যুত্থান (১৬০৬-১৬০৭), স্তেপান রাজিনের নেতৃত্বে (১৬৬৭-১৬৭১), এমিলিয়ান পুগাচেভের নেতৃত্বে (১৭৭৩-১৭৭৫) কৃষক অভ্যুত্থান; চীনে উনিশ শতকের মাঝামাঝি তাইপিন বিদ্রোহ।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শ্রেণী সংগ্রামে দাসতান্ত্রিক পর্বের তুলনায় মেহনতি জনগণ যোগ দেয় অনেক বেশি সংখ্যায়। গণ অভিযানগুলি হয়ে দাঁড়ায় অনেক একরোখা। কিন্তু দাস অভ্যুত্থানের মতো কৃষক অভ্যুত্থানগুলিও ছিল স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্রের, কম সংগঠিত। অবজেকটিভ পরিস্থিতির (অর্থনৈতিক খণ্ডবিখণ্ডতা, কৃষকদের পশ্চাৎপদতা ইত্যাদি) কারণে এইসব অভ্যুত্থান সর্বরাষ্ট্রীয় আয়তনে সাফল্য লাভ করতে পারে নি। কিন্তু কৃষকদের বৈপ্লবিক অভিযানের তাৎপর্য সর্বাগ্রে এই যে সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি তা নড়িয়ে দেয় এবং অন্যান্য কারণের সঙ্গে মিলে শেষ পর্যন্ত তার পতন ঘটায়। সেইসঙ্গে কৃষকদের সংগ্রাম তাদের পোক্ত করেছে এবং নতুন, প্রলেতারীয় বিপ্লবের ভবিষ্যৎ যুগে জনগণের বড়ো বড়ো বৈপ্লবিক লড়াইয়ের আয়োজন করে গেছে।

সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণ ঘটে বুর্জোয়া

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্কের উচ্ছেদে উৎপাদনী উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্ত হয় নি, কেবল তার রূপ বদলেছে, সুতরাং শ্রেণীতে শ্রেণীতে সমাজের ভাগাভাগিও দূর হয় নি। মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ রয়েই গেছে, বদলেছে কেবল রূপ। বুর্জোয়া ব্যবস্থা জন্ম নিয়েছে মুক্তি, সমতা, সৌভ্রাত্রের ধ্বনি দিয়ে। কিন্তু এসব ধ্বনি বুর্জোয়ারা কাজে লাগিয়েছে কেবল সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের ঠেলে সরিয়ে নিজেরা ক্ষমতা লাভের জন্য। সমতার বদলে দেখা দিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্যের নতুন এক অতল গহ্বর। সৌভ্রাত্র নয়, বুর্জোয়া সমাজে চলছে নিষ্ঠুর শ্রেণী সংগ্রাম।

পুঁজিতন্ত্রে শ্রেণী সংগ্রাম চূড়ান্ত তীব্রতা আর প্রপীড়নের মধ্যে দিয়ে যায়। প্রলেতারিয়েতের আবির্ভাবে শ্রেণী সংগ্রামের ছবিটা, তার চরিত্র ও পরিপ্রেক্ষিত নীতিগতভাবে বদলে গেছে। প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব ঐতিহাসিক ভূমিকা হল এই যে তারা এগিয়ে আসে বুর্জোয়ার এবং সেইসঙ্গে পুরনো সমাজের সমাধিখনক হিশেবে।

পুরনো শোষিত শ্রেণী, দাস আর ভূমিদাসদের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের পার্থক্যটা এইখানে যে এরা নতুন, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্কের বাহক। তাদের অস্তিত্ব অর্থনীতির অগ্রণী রূপ, বৃহৎ যান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত। নিজেদের শ্রমের পরিস্থিতিরই কারণে প্রলেতারিয়েত ঐক্যবদ্ধ, সংগঠিত, শৃঙ্খলানুবর্তী হবার শিক্ষা পায়। উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত

হওয়ায় তাদের আগ্রহ নেই ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষায়।

বিশ্ব ইতিহাসে পুঁজিতন্ত্র শেষ বৈরগর্ভ ব্যবস্থা, বুর্জোয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে মেহনতিদের আপোসহীন সংগ্রাম পরিণত হয় কেবল উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক রূপের উচ্ছেদেই নয়, খোদ শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের চূড়ান্ত বিলোপে। এতে প্রলেতারিয়েত হল সমস্ত নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের নেতা। তার কারণ উৎপাদনে তাদের অবস্থান, যাতে প্রধান ভূমিকা প্রলেতারিয়েতের। তারা হল বৈষয়িক সম্পদের প্রত্যক্ষ উৎপাদক, সবচেয়ে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী, যৌথতার ভাবাদর্শ ও মনোবৃত্তির বাহক।

পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুঁজির প্রভুত্বের বিরুদ্ধে মেহনতিদের সঙ্গতিশীল সংগ্রামের অনিবার্য পরিণাম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব হল শোষকদের প্রতিরোধ দমন, সমাজতন্ত্রের নির্মাণ ও সংহতির উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গতিপথে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক শ্রেণীর আধিপত্য।

শ্রেণী সংগ্রামে আকীর্ণ হয় বুর্জোয়া সমাজজীবনের সমস্ত দিক: অর্থনীতি, রাজনীতি, ভাবাদর্শ। অন্যান্য সমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতো পুঁজিতন্ত্রের পরিস্থিতিতেও উৎপাদনী শক্তির বিকাশকে সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করে শ্রেণী সংগ্রাম। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অর্জন, নাগরিক অধিকার প্রসারও বহু পরিমাণে রূপায়িত হয় প্রলেতারীয় সংগ্রামের কল্যাণে।

শ্রমিক শ্রেণী এগিয়ে আসে শোষণ উচ্ছেদের সংগ্রামে

অগ্রণী ও দৃঢ়সংকল্প যোদ্ধা হিশেবে, হয়ে দাঁড়ায় বিশ্বের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের প্রধান চালিকা শক্তি। কেবল প্রলেতারিয়েতই শিল্পোৎপাদনে তার অর্থনৈতিক ভূমিকার দরুন নিজেদের মুক্তির জন্য সংগ্রামে সমস্ত মেহনতিদের নেতা হতে সক্ষম। বিগত দশকগুলির ঘটনাবলিতে পুরোপুরি প্রমাণিত হয়েছে এই প্রতিপাদ্য। শ্রমিক শ্রেণী হল একচেটিয়াদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রবল প্রতিপক্ষ, সমাজের সমস্ত মেহনতি স্তরের ভারকেন্দ্র।

অধিকাংশ পুঁজিতান্ত্রিক দেশে প্রলেতারিয়েতের প্রধান সহযোগী হল মেহনতি কৃষক সম্প্রদায়। সমাজে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বহু দিক থেকে প্রলেতারিয়েতের অবস্থা থেকে পৃথক নয়। জমিদার, বুর্জোয়া, ব্যবসায়ী, কুসীদজীবী এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে একচেটিয়ারাও শোষণ করে তাদের। কিন্তু ক্ষুদে উৎপাদকদের শ্রেণী যেহেতু ব্যক্তিগত মালিকদের নিয়ে গঠিত, তাই শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের মধ্যে দেখা যায় অদৃঢ়তা, দোদুল্যমানতা। প্রলেতারিয়েতের নেতৃভূমিকা থাকলে এ শ্রেণী দৃঢ়সংকল্প ও লক্ষ্যমুখী ক্রিয়াকর্মে সক্ষম। একচেটিয়া-বিরোধী শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ সতেজ ক্রিয়াকর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমস্ত গণতান্ত্রিক ধারাকে এমন এক রাজনৈতিক মৈত্রীতে ঐক্যবদ্ধ করার অনুকূল পূর্বশর্ত গড়ে উঠেছে যা দেশের অর্থনীতিতে একচেটিয়ার ভূমিকা চূড়ান্তরূপে সীমিতকরণ, বৃহৎ পুঁজির ক্ষমতার অবসান, এবং আমূল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সক্ষম।

আর এই গণতান্ত্রিক মৈত্রীর মূলশক্তি হতে পারে কেবল শ্রমিক শ্রেণী।

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পর্বেও শ্রেণী সংগ্রামের স্থান থাকে। এটা হল পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সমাজতান্ত্রিকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পর্ব। তখনকার শ্রেণী সংগ্রাম হল অপ্রলেতারীয় মেহনতি জনগণের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ রাষ্ট্রক্ষমতাজয়ী শ্রমিক শ্রেণী আর উৎখাত প্রতিক্রিয়াশীল শোষক শ্রেণী আর তাদের সমর্থক আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ার মধ্যে সংগ্রাম। শ্রমিক শ্রেণী এই পর্বে শোষক শ্রেণীদের উচ্ছেদ, সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠন আর সমাজতন্ত্রের বিজয় নিশ্চিতির জন্য এগিয়ে আসে।

শ্রেণী সংগ্রাম হল বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের সাধারণ নিয়ম। এ সংগ্রাম অপরিহার্য কেননা প্রলেতারিয়েত ক্ষমতা লাভ করলেই শ্রেণী আর তাদের বিরোধ, এমনকি অমীমাংসেয় বৈর স্বার্থ সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্ধান করে না। উৎখাত শোষক শ্রেণীরা পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পর্বে ন্যূনাধিক দীর্ঘকাল টিকে থাকে এবং যে নতুন ক্ষমতা তাদের রাজনৈতিক প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়েছে, তাদের কাছে যা সর্বাধিক পবিত্র সেই ব্যক্তিগত মালিকানায় হামলা করেছে, তার বিরুদ্ধে নির্মম প্রতিরোধ চালাতে থাকে।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে শোষক শ্রেণীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা হারালেও নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান বজায় রাখে। তাদের আওতায় থাকে বেশ কিছু বৈষয়িক উপায়াদি, জ্ঞান আর

উৎপাদন সংগঠন ও পরিচালনার অভিজ্ঞতা, পুরনো অর্থনৈতিক, নাগরিক আর সামরিক যন্ত্রের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে. তথা আন্তর্জাতিক পুঁজির সঙ্গে ব্যাপক যোগ-সম্পর্ক। দেশের অভ্যন্তরে উৎখাত বুর্জোয়া নির্ভরস্থল পায় ক্ষুদ্রপণ্য উৎপাদনে, কাজে লাগায় কৃষকদের, বিভিন্ন অন্তর্বর্তী স্তরের দোলায়মানতা। এসবের ফলে পুরনো ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভরসায় তার জোর পায়। তাই উৎক্রমণ পর্বে প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য স্থাপনে বোঝায় শ্রেণী সংগ্রামের অবসান নয়. নতুন পরিস্থিতিতে নতুন রূপ আর নতুন উপায়ে তার প্রলম্বন।

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র তার বাধ্যকরণ, প্রশাসন আর লালনের সংস্থাদি সহ পুরনো দুনিয়ার শক্তি ও রেওয়াজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান হাতিয়ার। প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের রূপ হয় নতুন সমাজব্যবস্থার সংহতি, রক্ষণ ও বিকাশের কর্তব্য পালনের উপযোগী এবং তাতে থাকে কেবল বলপ্রয়োগের উপায়াদিই নয়, সমাজতন্ত্র নির্মাণের স্বার্থে অর্থনীতি এবং সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজের জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকেদের টেনে আনার মতো পদ্ধতিও।

এমন দেশ ছিল না এবং নেই যা শোষকদের প্রতিরোধ ছাড়াই সমাজতন্ত্রে উত্তরণ করেছে এবং তাদের দমনের আবশ্যিকতা এড়াতে পেরেছে। তবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উৎখাত শ্রেণীদের প্রতিরোধ মোটেই একইরকম নয় এবং তা নির্ভর করে সর্বাগ্রে দেশের অভ্যন্তরে, তারপর আন্তর্জাতিক আয়তনে বিপ্লব ও

প্রতিবিপ্লবের শক্তি অনুপাতের ওপর। এই অনুপাত যদি এমন দাঁড়ায় যে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লব বিজয়ী বিপ্লবকে প্রতিরোধের চূড়ান্ত নিষ্ঠুর সামরিক উপায়াদি অবলম্বনের সুযোগ পাচ্ছে, তাহলে তারা সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রতিবিপ্লবী কু'দেতা, গৃহযুদ্ধ, সামরিক হস্তক্ষেপ ইত্যাদি ঘটায়।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের গতিপথে শ্রমিক শ্রেণী শ্রেণী সংগ্রামকে চূড়ান্ত মাত্রায়, সামরিক রূপে তুলে দিতে আগ্রহী নয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে দেশের অভ্যন্তরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সামাজিক ভিত্তি যত প্রসারিত এবং সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যত বিচ্ছিন্ন হয় আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রেণী শক্তির অনুপাত বদলে যায় সমাজতন্ত্রের অনুকূলে, বুর্জোয়াদের ক্রমেই বড়ো একটা অংশ ততই বুঝতে পারে শ্রমিক ক্ষমতা প্রতিরোধের সামরিক রূপ গ্রহণে কোনো লাভ নেই, নিজেদের পক্ষেই তা সর্বনাশা। এটা সাধারণ প্রবণতা, তবে অবশ্যই বর্তমান পরিস্থিতিতেও তাতে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতম রূপগ্রহণ নাকচ হয় না।

উৎক্রমণ পর্বে উৎখাত বুর্জোয়ার নানান স্তর ও গ্রুপের প্রসঙ্গে শ্রমিক শ্রেণী নমনীয় ও বিভিন্নকৃত নীতি অনুসরণ করে, সেটা হতে পারে নির্মম দলন থেকে নানা ধরনের আপোষ এবং ক্ষতিপূরণ দিয়ে পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগ কিনে নেওয়া পর্যন্ত। সেই সঙ্গে তারা পুরনো বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের স্বপক্ষে টানার চেষ্টা করে। যেমন,

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত, অথবা প্রায় সমস্ত বুর্জোয়াই নতুন ক্ষমতার সঙ্গে কোনো আপোসে যেতে চায় না, দৃঢ় একরোখা বিরোধিতা করে তারা। এর ফলে বুর্জোয়াকে 'কাজে লাগানো' কঠিন হয়। সেইসঙ্গে এখানে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের প্রলেতারীয় ক্ষমতার পক্ষে টানার সমস্যা ছিল খুবই তীব্র। জনগণতন্ত্রের দেশগুলিতে বুর্জোয়াকে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা দেখা গেল অনেক বেশি, তাই পুঁজিতান্ত্রিক শিল্প ও বাণিজ্যের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের লোকেদের টানার জন্য বহুবিধ রূপ ও পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছে। এইসব সম্ভাবনা অনেক বাড়তে পারে যখন প্রলেতারিয়েত ক্ষমতায় আসে প্রবল একচেটিয়াবিরোধী ফ্রন্টের নেতা হিশেবে।

উৎক্রমণ পর্বে প্রলেতারিয়েতকে কেবল প্রত্যক্ষ শোষক শ্রেণীদের বিরুদ্ধেই নয়, অন্তর্বর্তী অপ্রলেতারীয় স্তরগুলির ওপর বুর্জোয়া প্রভাবের বিরুদ্ধেও, উৎখাত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে একেবারে কোণঠাসা করার জন্য, শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের পার্টির নেতৃভূমিকা শক্তিশালী করার জন্যও শ্রেণী সংগ্রাম চালাতে হয়। এই প্রসঙ্গে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের লক্ষ্য হল মেহনতিদের অপ্রলেতারীয় জনগণের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর পাকাপোক্ত মৈত্রী নিশ্চিত করা, প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ার অধীনস্থ হতে তাদের না দেওয়া।

লোকেদের সমাজতান্ত্রিক পুনঃশিক্ষা, তাদের চেতনা ও আচরণে অতীতের জের উৎপাটনও এ পর্বে

প্রলেতারীয় শ্রেণী সংগ্রামের কর্তব্য। তার কেন্দ্রে থাকে নতুন শৃংখলা, সংগঠনশীলতা, শ্রমের প্রতি কমিউনিস্ট মনোভাবের জন্য সংগ্রাম।

ফলত, মানবজাতির ইতিহাস বিচার করে আমরা নিঃসন্দেহ হই যে শ্রেণী সংগ্রাম হল **সমস্ত বৈরগর্ভ ব্যবস্থা বিকাশের অবজেকটিভ নিয়ম**। কেবল শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমেই নির্দিষ্ট সমাজটির বৈরবিরোধের সমাধান হয়েছে, উৎসাদিত হয়েছে নির্দিষ্ট শ্রেণীগুলির জন্মদাতা উৎপাদনের প্রণালীটি, উত্তরণ ঘটেছে সমাজজীবনের অন্য একটা উন্নততর ধাপে।

৩। শ্রেণী সংগ্রামের রূপ

শত্রু শ্রেণী প্রসঙ্গে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ থেকে শুরু করে তার অবস্থানের ওপর সক্রিয় হামলা আর অতি তীব্র শ্রেণী সংঘর্ষ অবধি শ্রেণী সংগ্রামের প্রখরতা হয় নানা মাত্রার। তা হতে পারে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য, স্বতঃস্ফূর্ত বা সচেতন। এ সংগ্রামের একটা রূপ থেকে অন্য রূপে বদল নির্ভর করে পরিস্থিতির পরিবর্তন, বিভিন্ন শ্রেণী স্বার্থের মধ্যে বিরোধে তীব্রতার মাত্রা, প্রতিটি শ্রেণীর বিকাশের ওপর।

শ্রেণী সংগ্রামের রূপ শ্রেণী সংগঠনের রূপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেটা বিশেষ জাজ্বল্যমানরূপে দেখা যেতে পারে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টান্ত থেকে। পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েত সংগ্রাম চালায়

তিনটি প্রধান রূপে: **অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক** আর **ভাবাদর্শীয়।**

অর্থনৈতিক সংগ্রাম হল ইতিহাসের দিক থেকে প্রলেতারীয় শ্রেণী সংগ্রামের প্রথম রূপ। সমস্ত দেশেই শ্রমিকদের সংগ্রাম শুরু হয়েছে দৈনন্দিন অর্থনৈতিক আশু স্বার্থ রক্ষা থেকে। তারা লড়েছে বেতন বৃদ্ধি, শ্রমদিন হ্রাস, শ্রমের পরিস্থিতি উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য। এই সংগ্রামে দেখা দেয় শ্রমিকদের প্রথম সংগঠন — ট্রেড ইউনিয়ন যা তাদের কাছে হয়ে দাঁড়ায় শ্রেণী সংগ্রামের বিদ্যালয়। অর্থনৈতিক সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল ধর্মঘট।

নিজেদের প্রত্যক্ষ স্বার্থের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম দেখা দেয় পুঁজিতন্ত্রের জন্মলগ্ন থেকে। যার আদি পর্বে সেটা ছিল শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সংঘর্ষের প্রধান ক্ষেত্র।

অর্থনৈতিক সংগ্রামের তাৎপর্য কেবল এই নয় যে প্রলেতারিয়েতের নিঃস্বীভবন প্রক্রিয়ার প্রতিরোধ করা হচ্ছে, আরো ব্যাপক বৈপ্লবিক কর্তব্য সাধনের জন্য তাদের সংগঠিত করতেও তা সাহায্য করে। পুঁজির লুঠেরা প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করলে শ্রমিকেরা পরিণত হত ধ্বংসে দণ্ডিত, ক্লেশজর্জরিত কাঙালদের এক নিরাকার পুঞ্জে। পুঁজির সঙ্গে দৈনন্দিন সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী যদি ভীরুর মতো হাল ছেড়ে দিত, তাহলে আরো উচ্চতর, পরিপক্ক রূপের শ্রেণী সংগ্রাম, রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করার সামর্থ্য হারাত তারা।

তবে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য

সংগ্রামের অত্যন্ত গুরুত্ব থাকলেও পুঁজিতান্ত্রিক শোষণ থেকে তা শ্রমিককে মুক্তি দিতে পারে না। কেবল অর্থনৈতিক সংগ্রাম পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্পর্শ করে না, পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত মালিকানা আর তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা তা অক্ষুণ্ণ রেখে দেয়। সর্বোত্তম ক্ষেত্রে তা বুর্জোয়ার কাছ থেকে এক-একটা ছাড় আদায় করতে পারে। তাই অর্থনৈতিক সংগ্রামকে প্রথম স্থান দিলে, প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামকে সামান্য কিছু প্রাপ্তির জন্য সংগ্রামে পর্যবসিত করলে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের ক্ষতি হয়, বদ্ধপরিকর বৈপ্লবিক সংগ্রাম থেকে তারা সরে যায়। এ প্রবণতাটা **সুবিধাবাদের** সঙ্গে জড়িত, যাতে বোঝায় শ্রমিক আন্দোলনের পলিসি ও ভাবাদর্শকে অপ্রলেতারীয় (বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া) স্তরের স্বার্থ ও দাবির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া।

প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপ হল **রাজনৈতিক** সংগ্রাম, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রাম চালায় তাদের মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য, যথা:

— সামাজিক মুক্তি;

— পুঁজিতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার উৎসাদন;

— গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জন;

— শান্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা।

অর্থনৈতিক সংগ্রাম যেখানে মেহনতিদের নিত্যকার সামাজিক-অর্থনৈতিক চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সীমিত, রাজনৈতিক সংগ্রামে সেক্ষেত্রে বোঝায় প্রলেতারিয়েতের মৌল স্বার্থের জন্য সংগ্রাম। শ্রেণীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক স্বার্থ পূরণ হতে পারে কেবল

আমূল রাজনৈতিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে। ঠিক রাজনৈতিক সংগ্রামের পথেই শ্রমিক শ্রেণীর কাছে উৎপাদনের উপায় ও রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরের মতো তার যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ তা পূরণ হতে পারে। **প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রধান কাজ হল পুঁজিপতি শ্রেণীর উচ্ছেদ করে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা।** ক্ষমতা জয়ের পর প্রয়োজন হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার হিশেবে সে ক্ষমতার সংহতি।

রাজনৈতিক সংগ্রাম হল প্রলেতারিয়েতের গোটা শ্রেণীর সংগ্রাম। এক-একজন কলমালিকের বিরুদ্ধে মেহনতিদের এক-একটা উৎপাদনী দলের সংগ্রাম এটা নয়, এ হল গোটা পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে গোটা শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম।

প্রলেতারিয়েতের মৌল স্বার্থের জন্য, ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম চালানো হয় যেমন বৈধ, শান্তিপূর্ণ পথে, তেমনি বলাত্মক উপায়ে, সশস্ত্র সংগ্রামের আশ্রয় নিয়ে।

রাজনীতির ক্ষেত্রটা কেবল শ্রেণীগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে নয়, জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কও তার অন্তর্গত। তাই আন্তর্জাতিক রণাঙ্গনে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে এসে যায় শান্তির জন্য, জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম। বিশ্ব বিকাশের বর্তমান যে পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য সমাজতন্ত্রের অনুকূলে শক্তি অনুপাতের পরিবর্তন, সমাধিকারী সহযোগিতা ও জাতিসমূহের নিরাপত্তার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সুসঙ্গত সংগ্রাম তখনো রাজনৈতিক সংগ্রাম হয়ে দাঁড়ায় অতি অত্যাবশ্যক।

প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক সংগ্রাম বিকশিত হয়েছে অর্থনৈতিক সংগ্রামের পরে, কিন্তু তাৎপর্যের দিক থেকে তার গুরুত্বই প্রধান। এটা হল শ্রেণী সংগ্রামের উচ্চতর রূপ। তার কারণ:

— অর্থনৈতিক সংগ্রামে শোষকদের বিরুদ্ধে এগোতে পারে শ্রমিক শ্রেণীর এক-একটা বাহিনী (যেমন, এক-একটা উদ্যোগের শ্রমিকেরা), রাজনৈতিক সংগ্রামে শ্রমিক ও পুঁজিপতিরা পরস্পরের সম্মুখীন হয় গোটাগুটি শ্রেণী হিশেবে;

— অর্থনৈতিক সংগ্রামে শ্রমিকেরা রক্ষা করে নিজেদের আশু, নিত্যনৈমিত্তিক স্বার্থ, প্রায়ই শ্রমিক শ্রেণীর আলাদা আলাদা কোনো গ্রুপের স্বার্থ, রাজনৈতিক সংগ্রামে রক্ষা করে মৌল, সমগ্র শ্রেণীর স্বার্থ;

— অর্থনৈতিক সংগ্রাম যদি চলে রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, তাহলে তাতে কেবল শ্রমিকদের সংকীর্ণ, বৃত্তিগত স্বার্থের বোধ জন্মায়। রাজনৈতিক সংগ্রামে দেখা দেয় শ্রমিকদের সত্যকার শ্রেণীগত, প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক চেতনা, নিজেদের মৌল শ্রেণীব্যাপ্ত স্বার্থ, নিজেদের ঐতিহাসিক ব্রত, বৈপ্লবিক কর্তব্যের উপলব্ধি;

— অর্থনৈতিক সংগ্রাম ট্রেড ইউনিয়নে প্রলেতারিয়েতের সংগঠন আবশ্যক করে তোলে। রাজনৈতিক সংগ্রাম দাবি করে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টি, যা প্রলেতারিয়েতের সর্বোচ্চ রূপের শ্রেণী সংগঠন।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকের সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের একটা গুরুত্বপূর্ণ রূপ হল **ভাবাদর্শীয় সংগ্রাম**। ব্যাপক অর্থনৈতিক এবং বিশেষ করে রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতকে উত্থিত করতে হলে সে যাতে তার মৌল শ্রেণীগত স্বার্থ বুঝতে পারে তার জন্য সাহায্য করা উচিত। শ্রমিক এই বোধটা পায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র থেকে। সমাজ বিকাশের নিয়মগুলি উদ্‌ঘাটিত করে এই তত্ত্ব শ্রমিক শ্রেণীকে দেখিয়েছে শোষণ থেকে মুক্তির জন্য, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের পথ ও পদ্ধতি।

শ্রমিক শ্রেণীর, তাদের পার্টির ভাবাদর্শীয় সংগ্রামের কাজ হল বুর্জোয়া ধ্যানধারণা আর কুসংস্কার থেকে তাদের চেতনাকে মুক্ত করা। স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলনে বৈজ্ঞানিক ভাবাদর্শের সঞ্চারে সে আন্দোলন উঠে যায় বিকাশের উচ্চতম ধাপে। তাই প্রলেতারিয়েতের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য শ্রেণী সংগ্রামের ভাবাদর্শীয় রূপ তার অন্যান্য রূপের মতোই সমান আবশ্যক।

সারা বিশ্বে শ্রমিক শ্রেণী এবং সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলি যে ভাবাদর্শীয় সংগ্রাম চালাচ্ছে, তার মূলকথা হল:

— সমাজ বিকাশের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রচার;

— সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের শোষক মর্মার্থের স্বরূপমোচন;

— বৈরী শ্রেণীগর্ভ ব্যবস্থার ঐতিহাসিক মৃত্যুদণ্ডের প্রতিপাদন;

— সমস্ত মেহনতি ও শোষিত জনগণের বৈপ্লবিক

সংগ্রামের শীর্ষে দণ্ডায়মান, শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সঙ্গতিপরায়ণ যোদ্ধা হিশেবে শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা উদ্‌ঘাটন;

— শ্রমিক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ভাবাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি — মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠা।

সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির ভাবাদর্শীয় সংগ্রামের আশু লক্ষ্য হল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সবচেয়ে আগ্রাসনমুখী একচেটিয়া শীর্ষটিকে ভাবাদর্শের দিক থেকে একঘরে করা, তাতে এক-একটা দেশে প্রগতিশীল সামাজিক পুনর্গঠন এবং তীব্রতম আন্তর্জাতিক সমস্যাদি, সর্বাগ্রে যুদ্ধ ও শান্তির যে সমস্যা তার নিয়ামন, দুইয়েতেই সাহায্য হবে।

সমাজতান্ত্রিক শক্তিরা যে ভাবাদর্শীয় সংগ্রাম চালাচ্ছে, তার মূলগত লক্ষ্য হল লোকেদের এইটে দেখানো যে মানবজাতির ভবিষ্যৎ হল কমিউনিজম এবং ভবিষ্যতের সবচেয়ে হ্রস্ব ও যন্ত্রণাহীন পথ কী।

এ সংগ্রামে বুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের লক্ষ্য একেবারে বিপরীত। সে লক্ষ্য হল উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার অটলতা দেখানো, তীক্ষ্ণ সামাজিক সমস্যা থেকে জনগণের মনোযোগ সরানো, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, শোভিনিস্ট ও বর্ণবাদী ভাবনাচিন্তা, সামরিকতা প্রচার, শ্রমিক শ্রেণীর ভাবাদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকৃত, ও হেয় করা, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো।

এই হল প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক সংগ্রামের

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শীয় রূপের মর্মার্থ, কাজ আর বিষয়। এই রূপগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। তারা থাকে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায়।

পুঁজিতন্ত্রের দেশগুলিতে বর্তমান পর্বের বৈশিষ্ট্য হল পুঁজিপতিদের শুধু একএকটা গ্রুপের বিরুদ্ধেই নয়, রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া প্রভুত্বের গোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই শ্রমিক সংগ্রামের যথেষ্ট সক্রিয়তা বৃদ্ধি। শ্রমিক শ্রেণীর, মেহনতি জনগণের বড়ো বড়ো অভিযানগুলি এমনসব শ্রেণী যুদ্ধের অগ্রদূত, যা ঘটাতে পারে বনিয়াদি সামাজিক পুনর্গঠন, প্রতিষ্ঠা করতে পারে মেহনতিদের অন্যান্য স্তরের সহযোগে শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা।

বিগত দশকগুলির শ্রেণী সংগ্রামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল এই যে সাম্রাজ্যবাদ ক্রমেই বেশি করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আঘাতের মুখে পড়ছে। জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম বহু দেশে পরিণত হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক, শোষণ সম্পর্কের বিরুদ্ধেই সংগ্রামে।

সমাজ বিকাশের প্রধান প্রধান চালিকা শক্তি — বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শক্তি এবং শ্রমিক কমিউনিস্ট আন্দোলন, সদ্যোমুক্ত রাষ্ট্রগুলির জনগণের আন্দোলন, ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলন — এদের বর্ধমান সহযোগিতা শেষ পর্যন্ত শান্তি, গণতন্ত্র, সামাজিক প্রগতি আর সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদকে বাধ্য করে একের পর এক জায়গা ছেড়ে দিতে।

৪। শ্রেণী সংগ্রামে রাজনৈতিক পার্টির ভূমিকা

শ্রেণী সংগ্রামের গতিপথে, 'নিজেদের জন্য' শ্রেণী হয়ে ওঠার সময় বিপুল ভূমিকা ধরে রাজনৈতিক সংগঠন, বিশেষ করে **রাজনৈতিক পার্টির** উদ্ভব।

রাজনৈতিক পার্টি হল কোনো একটা শ্রেণী বা তার স্তরের সবচেয়ে সক্রিয় ও সংগঠিত অংশ। বিভিন্ন অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন (অর্থনৈতিক, ট্রেড-ইউনিয়ন, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, লোকহিতৈষী) থেকে রাজনৈতিক পার্টির পার্থক্য এই যে সর্বদাই তা নির্দিষ্ট একটা রাজনৈতিক লক্ষ্য অনুসরণ করে, সমাজের রাজনৈতিক জীবন ও ব্যবস্থায় নেতৃত্বমূলক প্রভাব ফেলতে চায়, ক্ষমতায় যেতে, নিজেদের লাইন কার্যকৃত করার জন্য তা ধরে রাখতে চেষ্টা করে।

সমাজের জীবন ও বিকাশে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীটি কী ভূমিকা নিচ্ছে (বৈপ্লবিক, প্রগতিশীল, রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়াশীল, প্রতিবৈপ্লবিক) তার ওপর নির্ভর করে তাদের স্বার্থের প্রতিনিধি পার্টিগুলির ঐতিহাসিক ভূমিকাও হয় বিভিন্ন। তবে রাজনৈতিক পার্টির সদস্যরা সবসময় সে সম্পর্কে সচেতন থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তারা ভাবতে পারে যে নিজেদের ক্রিয়াকর্মে তারা কোনো একটা বিমূর্ত ধর্মীয় অনুজ্ঞা, জাতীয় ধ্বনি ইত্যাদি রক্ষা করছে, কিন্তু অবজেকটিভ তাৎপর্যে তাদের ক্রিয়াকর্ম পালন করে অন্য ভূমিকা। যেমন, বিভিন্ন কৃষক পার্টি এগিয়ে আসে সমাজতন্ত্রের ধ্বনি দিয়ে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এমন কৃষি সংস্কারের জন্য

লড়ে যা পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অক্ষত রেখে দেয়।

প্রতিক্রিয়াশীল পার্টিরা জনবিরোধী লক্ষ্য অনুসরণ করলেও জনসমর্থনের প্রয়োজন থাকায় সাধারণত নিজেদের আসল উদ্দেশ্য ধামাচাপা দিয়ে বাগাড়ম্বরী কর্মসূচি আর ধ্বনি পেশ করে, প্রায়ই এমন নাম ধারণ করে যা তাদের আসল সত্তার অনুরূপ নয়। যেমন জার্মান একচেটিয়া পুঁজির সবচেয়ে আগ্রাসী মহলের পার্টি, ফ্যাসিস্ট পার্টি নাম নিয়েছিল 'জাতীয়-সমাজতান্ত্রিক' এমনকি 'শ্রমিক' পার্টিই। কোনো একটা রাজনৈতিক পার্টির আসল মূর্তি ধরতে হলে বিচার করা দরকার তার নাম, এমনকি কর্মসূচিও নয়, মূর্ত-নির্দিষ্ট বাস্তব ক্রিয়াকর্ম।

যেসব দেশে শ্রেণী বিভাগ অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, এমনকি সেখানেও রাজনৈতিক পার্টিগুলি তা যথাযথ প্রতিফলিত করে না, কেননা শ্রেণী ও সামাজিক স্তরের নানান গ্রুপের স্বার্থও তারা প্রকাশ করে।

শ্রেণী সংগ্রাম যত অবারিত হতে থাকে, ততই শ্রেণীর প্রয়োজন হয় একটিমাত্র এমন শক্তিশালী রাজনৈতিক পার্টি গড়ার যা নিজ শ্রেণীর মৌল স্বার্থ শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে সক্ষম।

প্রতিটি রাজনৈতিক পার্টি যেহেতু নির্দিষ্ট একটি শ্রেণীর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তাই সমাজজীবনে তার ভূমিকা নির্ধারিত হয় যে শ্রেণীর স্বার্থের তা অভিব্যক্তি, সেই শ্রেণীর সামাজিক স্থান আর অবস্থা দিয়ে। শ্রেণীবহির্ভূত রাজনৈতিক পার্টির কথা সমাজে জানা নেই। এক্ষেত্রে কোনো একটা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব

করছে একটি নয়, একাধিক পার্টি এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আধিপত্যকারী শ্রেণীর পার্টিগুলির মধ্যে বিরোধ অগভীর, লোকদেখানি। কিন্তু সে শ্রেণীর বিভিন্ন উপদলের মধ্যে গভীরতর মতভেদ যখন তাতে প্রকাশ পায়, তখন প্রগতিশীল শক্তিরা এ বিরোধ কাজে লাগাতে পারে নিজেদের স্বার্থে।

প্রতিটি পার্টির আসল চেহারা সবচেয়ে স্পষ্টাকারে প্রকাশ পায় শ্রেণী সংগ্রামের গতিপথে, সারা দেশকে ঝাঁকুনি দেওয়া গভীর সংকটের সময়। গুরুতর সংগ্রাম ঝেঁটিয়ে দূর করে যত রকমের বুলি আর কপট ধ্বনি, তুচ্ছ আর তাৎপর্যহীন সবকিছুকেই।

শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ প্রকাশ ও রক্ষা করে **শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি** — তাদের অগ্রণী, রাজনৈতিক দিক দিয়ে সংগঠিত ও সক্রিয় অংশ, তাদের অগ্রবাহিনী। শোষণের প্রবল পীড়নে পিষ্ট শ্রমিক শ্রেণীর অধিকাংশই পুঁজিতন্ত্রের পরিস্থিতিতে শ্রেণী চেতনার সেই মাত্রায় উঠতে পারে না যা তাদের অগ্রবাহিনীর বৈশিষ্ট্য। এমনকি ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠন যা অনেক সরল, শ্রমিকদের অপরিণত স্তরের চেতনার পক্ষে অনেক বোধগম্য, তাতেও সমগ্র প্রলেতারিয়েত যোগ দেয় এমন নয়। তাই একথা ভাবা ঠিক নয় যে পুঁজিতন্ত্রের পরিস্থিতিতে (এমনকি পুঁজিতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের পরিস্থিতিতেও) শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী অংশ আর গোটা শ্রেণীর মধ্যে সীমারেখাটা বুঝি-বা মুছে যেতে পারে। সেটা মুছবে যখন চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে কমিউনিজম।

রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় এবং সমাজের কমিউনিস্ট পুনর্গঠনের জন্য প্রলেতারিয়েতকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে প্রথম বৈপ্লবিক শ্রমিক পার্টি হল মার্কস ও এঙ্গেলস প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট লীগ (১৮৪৭-৫২)। সদস্যসংখ্যা বেশি না হলেও তার চরিত্র ছিল আন্তর্জাতিক এবং এটাই ইতিহাসে প্রথম মার্কসবাদী পার্টি।

পার্টি সম্পর্কে, সমাজজীবনে তার ভূমিকা ও তাৎপর্য, প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামে তার স্থান নিয়ে মতবাদে ভ. ই. লেনিনের অবদান বিপুল। তিনি হলেন নতুন, উচ্চতম ধরনের এমন এক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা যা একক লক্ষ্যে, ক্ষমতা দখল ও সমাজতন্ত্রের বিজয়ের জন্য শ্রেণী সংগ্রামের সমস্ত রূপকে চালিত করতে সক্ষম। এরূপ পার্টির নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী প্রলেতারীয় বিপ্লব ঘটায় এবং মেহনতি কৃষক ও জনবুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে নিয়ে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ শুরু করে।

মার্কসবাদী রাজনৈতিক পার্টি তার লক্ষ্যের স্পষ্টতা, পলিসির বৈজ্ঞানিকতা, জনগণের সঙ্গে বহুমুখী যোগাযোগের কারণে অন্য সমস্ত অপ্রলেতারীয় পার্টি থেকে একেবারে পৃথক। তার সমস্ত ভাবনা কেবল একটি মহান লক্ষ্যে নিবেদিত — শ্রমিকদের মুক্তি, সমাজতন্ত্রের জয়, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ছাড়া তার আলাদা কোনো 'পার্টি স্বার্থ' নেই। পার্টিতে প্রবেশ করে যারা নিজেদের হীন, ব্যক্তিগত স্বার্থ অনুসরণ করে, তাদের দূর করে পার্টি শুদ্ধ হয়ে ওঠে, প্রতিটি

সদস্যের কাছে তা দাবি করে যার জন্য তারা লড়ছে তার ন্যায্যতায় প্রগাঢ় প্রত্যয়, তার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগে প্রস্তুতি। এ পার্টি গড়ে ওঠে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি (অর্থাৎ কেন্দ্রীকরণ, একটি কেন্দ্র থেকে পরিচালনার সঙ্গে প্রগাঢ় ও ব্যাপক গণতান্ত্রিকতার মিলন), নেতৃত্বের যৌথতা, সমস্ত সদস্যের উদ্যোগ ও তৎপরতা, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা, অভ্যন্তরীণ শৃংখলার ভিত্তিতে। শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য সমস্ত সংগঠনে তা পরিচালক প্রভাব বিস্তার করে, এটাই হল শ্রমিক শ্রেণীর সর্বোচ্চ রূপের সংগঠন।

শ্রেণী সংগ্রাম এবং শোষক শ্রেণীদের পক্ষ থেকে অদৃঢ় লোকেদের ওপর চাপের পরিস্থিতিতে বিকশিত হতে থাকায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শ্রমিক পার্টিকে বহু মুশকিল আর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু সাফল্যের সঙ্গে এতে তারা উত্তীর্ণ হয়। বুর্জোয়া দেশগুলিতে পার্টি ক্রমশ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, অসংগঠিত জনগণ আর অন্যান্য পার্টির সেরা প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে অনুরাগী আকর্ষণ করে বাড়িয়ে তোলে তার পঙ্‌ক্তি। প্রগতিশীল সংঘ ও ইউনিয়ন গঠনে উদ্যোগ নেয় পার্টি, হয়ে দাঁড়ায় ঐক্যবদ্ধ দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক যুক্ত ফ্রন্টের সক্রিয় শরিক। যেসব দেশ সমাজতন্ত্রের পথে বিকশিত হচ্ছে, সেখানে পার্টি অর্জন করে প্রধান, নেতৃত্বের ভূমিকা। তাদের শক্তি বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ঘনবদ্ধতা, জনগণের ওপর ক্রমেই প্রগাঢ় প্রভাব হল ঐতিহাসিক আবশ্যিকতা, বর্তমান ঐতিহাসিক বিকাশের নিয়মবদ্ধতা।

প্রলেতারিয়েতের ট্রেড-ইউনিয়ন, সাংস্কৃতিক-জ্ঞানপ্রচারণী সমিতি প্রভৃতি সংগঠন শ্রেণী সংগ্রামে তাদের আবশ্যক হাতিয়ার, কিন্তু মূল কর্তব্য, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য তা সাধন করতে পারে না। কেবল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি প্রলেতারিয়েতের সর্বোচ্চ রূপের শ্রেণীগত রাজনৈতিক সংগঠন হওয়ায় সমস্ত প্রলেতারীয় সংগঠনকে সংযুক্ত করতে সক্ষম এবং তাদের চালিত করে একক লক্ষ্যে — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে।

কমিউনিস্ট ও শ্রমিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি শুধু শ্রমিকদের নয়, সমস্ত মেহনতির মূলগত স্বার্থের প্রকাশক। বর্তমানে এই পার্টিগুলি এক পরাক্রান্ত অদম্য শক্তি। মার্কস ও এঙ্গেলস প্রতিষ্ঠিত প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা যেখানে ছিল প্রায় ৪০০, সেখানে বর্তমানে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পঙ্‌ক্তিতে আছে কয়েক কোটি লোক, পরিণত হয়েছে তা আমাদের কালের এক সবচেয়ে প্রভাবশালী ও সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তিতে। একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা ঐক্যবদ্ধ করছে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে।

অন্যান্য পার্টির সঙ্গে ব্লক গঠনে, নির্বাচনী চুক্তিতে আসতে কমিউনিস্ট পার্টিরা আপত্তি করে না। কিন্তু সর্বদাই তাতে চালিত হয় কঠোর নীতিগত বিবেচনায়: সর্বাধিক বিপজ্জনক শত্রুর ওপর আঘাত হানার প্রয়োজনীয়তা, শ্রমিক শ্রেণী ও সমস্ত মেহনতির গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ রক্ষা। ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে মতভেদ

থাকলেও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিদের সঙ্গে, পেটি-বুর্জোয়া, কৃষক, দেশপ্রেমিক পার্টিদের সঙ্গে সহযোগিতা করে। এ সহযোগিতার যতটা ভিত্তি থাকে, সেই পরিমাণেই তা কার্যকৃত হয়। দেশে শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও তারা এইসব পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা চালিয়ে যায় যদি এই শেষোক্তরা বিপ্লবের শত্রুর পক্ষে না ভেড়ে। এতে সামাজিক পুনর্গঠন ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে ব্যাপকতম গণতান্ত্রিক শক্তিকে টানায় সাহায্য হয়।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিকাশের পক্ষে বিপুল গুরুত্ব ধরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতিগত ভিত্তিতে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির ঐক্যের জন্য সংগ্রাম।

শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক পার্টির পাশাপাশি বহু পুঁজিতান্ত্রিক দেশে সুবিধাবাদী পার্টিও থাকে।

শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদ একটা আপতিক ব্যাপার নয়। তার সামাজিক মূল থাকে, এটা হল শ্রমিকদের অদৃঢ় স্তরের ওপর বুর্জোয়াদের চাপের ফল।

শ্রমিক শ্রেণী সমগোত্রীয় নয়: তার ভেতর থাকে বিভিন্ন উপস্তর — পেটি বুর্জোয়া থেকে শ্রমিক শ্রেণীতে সম্প্রতি আগত লোকেরা, শ্রমিক অভিজাতদের উপরি স্তরেরা। সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতিতে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের বুর্জোয়ারা উপনিবেশ আর অর্থনৈতিক দিক থেকে নির্ভরশীল দেশদের লুট মারফত এবং

একচেটিয়া দাম ধার্য করে যে মুনাফা কামায়, তা দিয়ে প্রলেতারিয়েতের উপরি স্তরকে উৎকোচে কিনে নেবার সুযোগ পায়। এটাই শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদকে পুষ্ট করে। বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের সুফল আত্মসাৎ করে একচেটিয়া পুঁজি যে অতিমুনাফা লাভ করে, তাতেও শ্রমিকদের একাংশকে কিনে নেওয়া সম্ভব হয়।

শ্রমিক শ্রেণীর চরিত্র সমগোত্রীয় না হওয়ার ফলে বিভিন্ন স্তরের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়াসে ভেদাভেদ অনিবার্য, আর শ্রেণী সংগ্রাম বিকাশের প্রতিটি বাঁকেই এই মতভেদ বেড়ে ওঠে, দেখা দেয় সুবিধাবাদের যেমন দক্ষিণপন্থী, তেমনি 'বামপন্থী' ঝোঁক আর ধারা।

দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের সামাজিক ভিত্তি হল 'শ্রমিক অভিজাত', 'শ্রমিক আমলাতন্ত্র', এবং পেটি বুর্জোয়া থেকে আগতরা, সাম্রাজ্যবাদের কাছে যারা আত্মসমর্পণ করে, বৈপ্লবিক সংগ্রামের বদলে এমন এক-একটা সংস্কারের কথা বলে যাতে বুর্জোয়া ব্যবস্থার ভিত্তি নড়ে না। রাজনীতি ও ভাবাদর্শে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোস করে।

'বামপন্থী' সুবিধাবাদের সামাজিক ভিত্তি হল সেই পেটি-বুর্জোয়া স্তরটা, যাদের প্রলেতারীয় সংগঠনশীলতা, দৃঢ়তার অভাব থাকে, তার ফলে এই স্তরগুলো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ, একরোখা সংগ্রাম চালাতে অক্ষম। তাদের অতিবাম বুলি, হঠকারিতায় প্রকাশ পায় পুঁজিতন্ত্রের বীভৎসতায় ক্ষেপে ওঠা পেটি বুর্জোয়ার, ক্ষুদে মালিকের মেজাজ। কার্যক্ষেত্রে পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবপনার ভাবাদর্শ ও মনোবৃত্তির পরিণাম দাঁড়ায়

সংকীর্ণতা, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা, এবং শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়ার কাছে আত্মসমর্পণ।

বৈপ্লবিক আন্দোলন বিকাশের দ্বান্দ্বিকতা এমনই যে শ্রমিক শ্রেণীর বিশেষ করে অন্যান্য (যেমন, পেটি-বুর্জোয়া) সামাজিক স্তরের ব্যাপক অংশকে সংগ্রামে টেনে আনা একটা ইতিবাচক ব্যাপার হলেও একই সঙ্গে তা দক্ষিণ ও 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের পুষ্টিও বাড়িয়ে তুলতে পারে। সুবিধাবাদ, নানান ধারায় শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ভাঙন, জাতীয় কলহকে বুর্জোয়া কাজে লাগায় শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করার প্রধান হাতিয়ার হিশেবে। তবে কোনো কোনো দেশে তারা প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশকে কিছু সময়ের জন্য মন্থর করতে পারলেও তাকে থামিয়ে দিতে তারা অক্ষম।

পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ প্রকাশ ও রক্ষা করে **বুর্জোয়া পার্টিরা,** অবশ্য সযত্নে তাদের শ্রেণী মূর্তি আড়াল করে। তাদের ভাবাদর্শে দাবি করা হয় যে শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে পার্টির কোনো সম্পর্ক নেই। এর দৃষ্টান্ত হিশেবে তারা দেখায় যে অনেক পুঁজিতান্ত্রিক দেশে বহু পার্টির রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান, এই পার্টিগুলি নাকি সমাজে সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থ প্রকাশ করছে। আসলে এ ব্যবস্থায় বুর্জোয়া পার্টিগুলির শ্রেণী চরিত্র কেবল আড়ালে পড়ে, নাকচ হয় না। বিভিন্ন বুর্জোয়া পার্টি শ্রেণী চরিত্রে বুর্জোয়া হলেও একই সময়ে পুঁজিপতি শ্রেণীর বিভিন্ন গ্রুপের স্বার্থও প্রকাশ করে। এটাই হল তাদের রাজনৈতিক

কর্মসূচিতে নির্দিষ্ট কিছু কিছু পার্থক্যের. বুর্জোয়ার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য ও রূপায়ণের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যের কারণ। সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ও আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী গ্রুপেরা ফ্যাসিস্ট পার্টি স্থাপনের পথ নেয়।

কোন বুর্জোয়া পার্টি ক্ষমতায় রয়েছে, তাতে শ্রমিক শ্রেণীর বুঝি কিছু এসে যায় না, মোটেই তা নয়। দেশের রাজনৈতিক বিকাশের কোনো কোনো পর্বে সংগ্রামের রণকৌশল রচনার ক্ষেত্রে সেটা মনে রাখা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে **পেটি-বুর্জোয়া** পার্টিও কম নেই। পেটি বুর্জোয়ার বিভিন্ন স্তর ও সংশ্লিষ্ট গ্রুপের স্বার্থ প্রকাশ করে তারা। পেটি বুর্জোয়ার সামাজিক অবস্থানের দ্বৈততা হেতু এসব পার্টির পলিসি ও আচরণে দেখা দেয় সঙ্গতিহীনতা, দোলায়মানতা, সর্পিলতা, আচমকা বাঁক।

পুঁজিতন্ত্রের বিকাশে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে একচেটিয়া আর পেটি বুর্জোয়ার মধ্যে বিরোধ, বুর্জোয়ার কাছে পেটি-বুর্জোয়া স্তরেরা অনিবার্যই হটে যায় ও ধ্বংস পায়। তাদের বড়ো একটা অংশ ক্রমশ নিশ্চিত হয়ে উঠছে যে বৃহৎ পুঁজির পীড়ন থেকে বাঁচা সম্ভব কেবল গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে। এইভাবেই দেখা দিচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বাধীনে অপ্রলেতারীয় মেহনতি স্তরের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর জোটের. সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সাধারণ ফ্রন্টে পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলিকে টেনে আনার সামাজিক শর্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রেণী সংগ্রাম বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায় — সামাজিক বিপ্লব

১। সামাজিক বিপ্লব বলতে কী বোঝায়?

শ্রেণীগুলির সংগ্রাম যখন প্রকাশ্য চরিত্র ধারণ করে এবং এমন মাত্রায় বেড়ে উঠতে থাকে যে কোনো একটা শোষক শ্রেণীর আধিপত্য উচ্ছেদের কর্তব্য সাধিত হতে থাকে, তখন শ্রেণী সংগ্রাম পৌঁছয় তার সর্বোচ্চ রূপে, তা হল সামাজিক বিপ্লব। এটা হল শ্রেণী সংগ্রামের সবচেয়ে তীক্ষ্ণ রূপ, যা পুরনো সমাজ উল্টে করে যায় নতুন সমাজের দিকে। মার্কস সামাজিক বিপ্লবকে বলেছেন 'ইতিহাসের ইঞ্জিন'।

সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান ও টেকনিকে, উৎপাদন ও যোগাযোগের উপায়, লোকেদের বিশ্ববীক্ষা ইত্যাদিতে ঘটে যেমন ক্রমিক বিবর্তনমূলক পরিবর্তন, তেমনি উল্লম্ফনও। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যগুলির

ক্ষেত্রে 'বিপ্লব' কথাটা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তবে সমাজজীবনের এক-একটা দিকের পরিবর্তন বেশ গুরুত্বপূর্ণ হলেও, এমনিতে সেটা সমাজবিপ্লব নয়। সামাজিক বিপ্লব হল গোটা সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন।

নির্দিষ্ট ব্যবস্থাটির বিকাশের একটা পর্যায়, ধাপ থেকে অন্যটায় উত্তরণের সময় একই সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরেও গুণগত পরিবর্তন হয়। যেমন, পুঁজিতন্ত্রের প্রাক্-একচেটিয়া পর্যায় থেকে একচেটিয়ায়, সাম্রাজ্যবাদে উত্তরণ। কিন্তু এটা সামাজিক বিপ্লব নয়, কেননা পুঁজিতন্ত্রের মূলগত দিকগুলো, তার বনিয়াদ বজায় থেকে যাচ্ছে। বিপ্লব হল এমন পুনর্গঠন যা পুরনোর ভিত্তিটাকেই, শিকড়টাকেই চূর্ণ করে। সামাজিক বিপ্লব বলতে বোঝায় সমাজের বিকাশে গুণগত উল্লম্ফন, যার ফলে একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জায়গায় আসে অন্য আরেকটা। সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের অবজেকটিভ নিয়ম হল বিপ্লব।

সামাজিক বিপ্লবের সবচেয়ে সুগভীর কারণ হল নতুন উৎপাদনী শক্তি আর অচল হয়ে পড়া উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সংঘাত। এই সংঘাত আত্মপ্রকাশ করে শ্রেণীদের মধ্যে সংঘাতে, শ্রেণী সংগ্রামে। একদল শ্রেণী রক্ষা করে অচল হয়ে যাওয়া উৎপাদনী সম্পর্ক আর তার ভিত্তিতে দাঁড়ানো সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অন্যদল চেষ্টা করে সে সম্পর্ক উচ্ছেদ করতে। অচল হয়ে পড়া রাজনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে বিপ্লবী শ্রেণীরা, পুরনোকে চূর্ণ করে স্থাপন করে নতুন

রাষ্ট্রক্ষমতা। এই ক্ষমতা তারা ব্যবহার করে পুরনো উৎপাদনী সম্পর্ক দূর করে নতুন সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য।

সমাজজীবনের প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে — অর্থনীতি আর রাজনীতিতে আমূল পুনর্গঠন হল সামাজিক বিপ্লবের কাজ। সমাজের আত্মিক জীবনে, তার সংস্কৃতিতে ন্যূনাধিক প্রগাঢ় পরিবর্তনও বিপ্লবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অবিশ্যি সমস্ত বিপ্লবই যে এই কাজগুলি পুরোপুরি সম্পন্ন করেছে তা নয়।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিপ্লবের প্রধান কাজ হল অর্থনীতির পুরনো ব্যবস্থার স্থলে নতুন, উচ্চতর ব্যবস্থার প্রবর্তন। এর পূর্বশর্ত হল সর্বাগ্রে উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানা সম্পর্কে ওলটপালট।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব অচল হয়ে পড়া রাজনৈতিক ব্যবস্থা আর দানা বাঁধতে থাকা নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্ক অথবা অর্থনৈতিক বিকাশে পেকে ওঠা নতুন চাহিদার মধ্যে সংঘর্ষের সমাধান করে। তা গড়ে দেয় নতুন রাজনৈতিক ও আইনী ব্যবস্থা, যা নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংহতি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন। অর্থনৈতিক সম্পর্কে আমূল পরিবর্তন ঘটবে ততই সাফল্যের সঙ্গে যতই দৃঢ়ভাবে পুরনোকে ধূলিসাৎ করে গড়া হবে নতুন রাজনৈতিক ও আইনী প্রতিষ্ঠান।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের ভিত্তিতে চলে **ভাবাদর্শ ও সামাজিক মনোবৃত্তির** ক্ষেত্রে প্রগাঢ় পরিবর্তন। লোকেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইনী, নৈতিক, ধর্মীয়, শৈল্পিক, দার্শনিক

দৃষ্টিভঙ্গিতে, সামাজিক অনুভূতি ও প্রবৃত্তিতে দেখা দেয় আমূল পরিবর্তন।

বিপ্লবের মূলগত প্রশ্ন এবং তার প্রধান লক্ষণ হল এক শ্রেণীর কাছ থেকে অন্য একটা অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল, অগ্রণী শ্রেণীর নিকট রাষ্ট্রক্ষমতার হস্তান্তর। ওপরতলার যেসব পরিবর্তনে কোনো একটা শ্রেণীর আধিপত্যের ভিত্তি ধ্বসে না, কেবল ক্ষমতাধিষ্ঠিত এক-একদল লোকের বদলা-বদলি হয়, তা থেকে বিপ্লবের তফাৎ এইখানে। উৎপাদনের অধিকতর প্রগতিশীল প্রণালীর বাহক বৈপ্লবিক শ্রেণীটি কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা জয় তাই সত্যকার সামাজিক বিপ্লবের অতি গুরুত্বপূর্ণ নিরিখ।

প্রতিটি বিপ্লবেই উৎসাদিত হয় অচল হয়ে পড়া শ্রেণীর ক্ষমতা, সেটা তারা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয় না। এইদিক থেকে কোনো না কোনো রূপে বলপ্রয়োগ ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব। কিন্তু বলের প্রয়োগ হতে পারে বিভিন্ন রূপে, অবশ্য-অবশ্যই সশস্ত্র সংগ্রাম ধরে নিতে হবে, এমন নয়। সবই নির্ভর করে বিপ্লব সম্পাদনের মূর্ত-নির্দিষ্ট অবস্থার ওপর, শ্রেণী সংগ্রামের গতিপথের ওপর। কোন কোন শক্তি জয়লাভ করছে, নিজেদের ঐতিহাসিক কর্তব্যের সম্পাদন শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যেতে বৈপ্লবিক শক্তি কী মাত্রায় সক্ষম তার ওপর নির্ভর করে বিপ্লবের বিকাশ। বিপ্লবের জোয়ার আর ভাটা, চূড়ান্ত বিজয়ের পর্যায় আর প্রতিক্রিয়ার সাময়িক প্রভুত্ব, পুরনো ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন — এ সবই দেখা গেছে ইতিহাসে।

বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিকাশ আরো জটিল হয়ে ওঠে

ভেতরের আর বাইরের বিরোধগুলির বিজড়নে। **বিপ্লবের প্রধান উৎস — বৈরী শ্রেণীগুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধ।** কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বাইরের বিরোধ অর্থাৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ বিপ্লবের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। শেষোক্তটার প্রভাব সর্বদাই পড়ে অভ্যন্তরীণ বিরোধের ওপর, তাকে তা তীব্র করে তুলতে পারে, বৈপ্লবিক সংকটকে করে তুলতে পারে ত্বরিত বা মন্থর। কতকগুলি বিপ্লবের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ভেতরের আর বাইরের, উভয় বিরোধেরই নিষ্পত্তি। জাতীয় মুক্তি বিপ্লবগুলি এই ধরনের, বিদেশী উৎপীড়ক আর অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলি — এই উভয়েরই পীড়নের বিরুদ্ধে তা চালিত।

একটা থেকে আরেকটা বিপ্লবের পার্থক্য তাদের **চরিত্র ও চালিকা শক্তিতে।**

কী সামাজিক বিরোধের তা সমাধান করছে, কোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে তা চলেছে, তাই দিয়ে নির্দিষ্ট হয় **বিপ্লবের চরিত্র।** যেমন, ১৯০৫-১৯০৭ সালের রুশ বিপ্লবের চরিত্র ছিল বুর্জোয়া (যদিও তার নেতৃত্বে ছিল বুর্জোয়া নয়, প্রলেতারিয়েত), কেননা তার সম্মুখস্থ কাজ ছিল স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ এবং সামন্ততান্ত্রিক-ভূমিদাস সম্পর্কের জের নির্মূল করা।

একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অন্যটায় উত্তরণ কার্যকৃত হয় নির্মম শ্রেণী সংগ্রামে। যেসব শ্রেণী ন্যূনাধিক সচেতনভাবে পুরনো সমাজব্যবস্থা উচ্ছেদ করে নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কর্তব্য গ্রহণ করে এবং তার

জন্যে লড়ে, তারা হল **বিপ্লবের চালিকা শক্তি**। বিপ্লবের চালিকা শক্তির মধ্যে পড়ে সমস্ত শ্রেণী নয়, কেবল তারা, যারা বিপ্লব করে, অচল হয়ে পড়া শ্রেণীদের প্রতিরোধ চূর্ণ করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সামাজিক বিপ্লব ফরমাশ দিয়ে হয় না। বিপ্লব কেবল তখনই সফল হয়, যখন তার অবজেকটিভ শর্তের পরিপক্কতার সঙ্গে মেলে নিজেদের স্বার্থ সাধনের জন্য সংগ্রামী শক্তি, শ্রেণীগুলির সতেজ ক্রিয়াকলাপ।

বিপ্লবের অবজেকটিভ শর্ত — অচল হয়ে পড়া ব্যবস্থার সংকট, তার সমস্ত বিরোধের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি। বিপ্লবের অবজেকটিভ পূর্বশর্ত বলতে কেবল অর্থনৈতিক কারণ বোঝায় না। সামাজিক-রাজনৈতিক শর্ত, সর্বাগ্রে শ্রেণী বিরোধের বিকাশ, শ্রেণী শক্তিগুলির অনুপাতও তার অন্তর্গত। বিপ্লবের অবজেকটিভ পূর্বশর্তকে অর্থনৈতিক শর্তের সঙ্গে এক করে দেখলে এই বেঠিক সিদ্ধান্ত এসে যায় যে উৎপাদনী শক্তির বিকাশ মাত্রা দিয়ে আপনা আপনিই যেন বিপ্লবের পরিপক্কতা নির্ধারিত হয়ে যাবে।

কিন্তু উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে উৎপাদনী সম্পর্কের সংঘাত থাকলেই সর্বদা বিপ্লব ঘটে এমন নয়। বিভিন্ন পুঁজিতান্ত্রিক দেশে তেমন সংঘাত বহুদিন থেকেই বিদ্যমান, কিন্তু তার মানে বিপ্লবের সমস্ত অবজেকটিভ শর্ত সেখানে রয়েছে তা নয়। বিপ্লব সম্ভব হতে হলে আরো দরকার **বৈপ্লবিক পরিস্থিতি,** বিভিন্ন দেশে তার পেকে ওঠা নির্ভর করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ওপর।

বৈপ্লবিক পরিস্থিতি হল বিপ্লব ঘটবার জন্য অবশ্যক সামাজিক-রাজনৈতিক শর্তের সমষ্টি। তা হল অগ্রণী শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের অবজেকটিভ শর্তের পরিপক্কতার সূচক।

বিপ্লবী পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণগুলি এই:

১) 'ওপরতলার সংকট', অর্থাৎ প্রভু শ্রেণীগুলির পক্ষে অপরিবর্তিত আকারে স্বীয় আধিপত্য বজায় রাখার অসম্ভাব্যতা। এ সংকটে যে ফাটল দেখা দেয় তা দিয়ে ফেটে বেরয় নিপীড়িত শ্রেণীগুলির অসন্তোষ আর বিক্ষোভ। বিপ্লব শুরু করার পক্ষে 'নিচুতলা' অর্থাৎ নিপীড়িত জনগণ চাইছে না, শুধু এটাই যথেষ্ট নয়, আরো দরকার যেন 'ওপরতলা' আগের মতো থাকতে আর পারছে না।

২) সাধারণ মাত্রার চেয়ে নিপীড়িত শ্রেণীগুলির অভাব-অনটন আর দুর্দশার অনেক তীক্ষ্ণতাবৃদ্ধি। তা হতে পারে মেহনতী জনগণের অধিকারহীনতা ও হতভাগ্যতার সঙ্গে, নিপীড়িত স্তরগুলির অর্থনৈতিক দুরবস্থা বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত। শ্রেণী বৈরের তীক্ষ্ণতা বেড়ে উঠতে পারে একচেটিয়া পুঁজির একাধিপত্য আর স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে ব্যাপক সাধারণ-গণতান্ত্রিক জন আন্দোলন থেকে, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য বিদেশী নিপীড়কদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে।

৩) নিপীড়িত শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক সচেতনতার যথেষ্ট বৃদ্ধি, এরূপ পর্বে তারা 'শান্ত' বিকাশের প্রকৃতিগত নিষ্ক্রিয়তা ও জাড্য থেকে মুক্ত হয়ে আক্ষরিক অর্থেই যেন ছুটে যেতে চায় রাজনীতিতে।

বৈপ্লবিক পরিস্থিতি আবশ্যক, তবে সামাজিক বিপ্লবের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট নয়। বিপ্লবের সাফল্যের জন্য অবজেকটিভ শর্ত ছাড়াও দরকার বিপ্লবের সাবজেকটিভ কারিকার উপযুক্ত পরিপক্কতা।

বিপ্লবের সাবজেকটিভ কারিকার মধ্যে পড়ে:

১) জনগণের সচেতনতা, সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাবার জন্য তাদের প্রস্তুতি ও সংকল্প।

২) জনগণ ও তাদের অগ্রবাহিনীর সংগঠনশীলতা, যাতে বিপ্লবের বিজয়ের জন্য সংগ্রামে সক্ষম সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা, খণ্ড খণ্ড ভাবে নয়, একযোগে কাজ চালানো সম্ভব হয়।

৩) এমন পার্টি দ্বারা জনগণের পরিচালনা যা যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও সংগ্রামে পোক্ত, কাজ কর্মের সঠিক লাইন, সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশল রচনা এবং তা কার্যে পরিণত করতে সক্ষম।

বৈপ্লবিক পরিস্থিতির পর্যায় হবে যত উঁচু, তার আরো বিকাশে তত বেশি হতে থাকবে সাবজেকটিভ কারিকার ভূমিকা, সম্পত্তিধরদের ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রণী শ্রেণীগুলির সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি। সাধারণ জাতীয় সংকটের কালে সাবজেকটিভ কারিকার ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় নির্ধারক। কোনো না কোনো কারণে যদি প্রগতিশীল শ্রেণীরা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত না থাকে, তাহলে বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে ভাটা দেখা দেয়, ব্যাপক বৈপ্লবিক উত্তেজনা থিতিয়ে আসে।

সামাজিক বিপ্লবে প্রয়োজন অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ শর্তের ঐক্য। এই নিয়মটা সমস্ত বিপ্লবেই

প্রমাণিত হয়েছে। বিপ্লব থেকে ওঠার লক্ষণ বৈপ্লবিক পার্টির ক্রিয়াকলাপের ধারা, রণনীতি ও রণকৌশল স্থির করার পক্ষে বিপুল গুরুত্ব ধরে।

বিপ্লবের প্রশ্নের সঙ্গে সংস্কারের প্রশ্ন নিবিড়ভাবে জড়িত।

সামাজিক সংস্কার — এটা এমন রূপের সামাজিক পুনর্গঠন, সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের বিরোধ মীমাংসার জন্য (অথবা মীমাংসা হয়েছে এমন একটা ভাব করার জন্য) যা ঘটায় শাসক শক্তিরা।

সংস্কার মারফত অধিপতি শ্রেণী চেষ্টা করে কিছু সময়ের জন্য সামাজিক বিরোধ নরম করতে বা চাপা দিতে, জনগণের বৈপ্লবিক শ্রেণী চেতনাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে, মেহনতিদের শ্রেণী অভিযান সরিয়ে রাখতে অথবা একেবারেই এড়িয়ে যেতে। সংস্কারের প্রকৃতিই এমন যে সামাজিক বিরোধের মূল উৎস তা দূর করতে পারে না, সেটা পারে কেবল সামাজিক বিপ্লব।

তবে পুরনো ব্যবস্থার রক্ষকেরা যে সংস্কারকে কাজে লাগায় সে ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা, ধ্বংস নিবারণের জন্য, তার অর্থ এই নয় যে বিপ্লবীদের যেকোনো সংস্কারেরই বিরোধী হতে হবে। সংস্কারবাদীরা সংস্কারকে দাঁড় করায় বিপ্লবের বিপরীতে, সেটাই যেন পরম লক্ষ্য, চেষ্টা করে এই উপায়ে সংগ্রাম থেকে মেহনতিদের মনোযোগ সরাতে, বিপ্লবের শক্তিগুলিকে ছন্নছাড়া করতে। বিপ্লবীরা কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের পরিস্থিতিতে সংস্কারকে দেখে বৈপ্লবিক সংগ্রামের উপজাত ফল হিশেবে। সংস্কারকে তারা কাজে লাগায় বিপ্লব বিকাশের জন্য,

সংস্কারের জন্য সংগ্রামকে তারা শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের মূলগত কর্তব্য সাধনের অধীনস্থ করে।

শ্রেণী সংগ্রাম ও তার নিয়মগুলি বোঝার জন্য সামাজিক বিপ্লব কী তাই শুধু নয়, **প্রতিবিপ্লব** কী জিনিস তা জানাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অন্যটায় উৎক্রমণের যুগে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যে বিরোধ হল শ্রেণী সংগ্রামের নিয়ম।

সামাজিক প্রতিবিপ্লব বলতে বোঝায় সমগ্র ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য উৎখাত প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর রাজনৈতিক লড়াই। এ ব্যাপারে উৎখাত শ্রেণী সাধারণত তার নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী স্তরগুলির ব্যাপক প্রতিবিপ্লবী আন্দোলনের ওপর নির্ভর করে। নিজেদের লক্ষ্যার্জনের জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী সর্বদাই সশস্ত্র বলপ্রয়োগের চূড়ান্ত পদ্ধতির আশ্রয় নেয়, কেবল জনক্ষমতার আইন নয়, মানবিক নৈতিক মানেরও এতটুকু পরোয়া করে না।

প্রতিবিপ্লব হল পশ্চাৎমুখী সামাজিক প্রক্রিয়া, সামাজিক বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া। তার অবজেকটিভ সারার্থে তা অচল হয়ে পড়া সমাজব্যবস্থা রক্ষা বা তার পুনরুদ্ধারে নিয়োজিত।

প্রতিবিপ্লবের সামাজিক ভিত্তি হল শোষক শ্রেণীরা, বিপ্লবের ফলে যারা ক্ষমতা, মুনাফা, বিশেষ সুবিধা হারিয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে এরা সমাজের নগণ্য সংখ্যালপ। বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে তাদের প্রয়োজন ন্যূনাধিক ব্যাপক সমর্থন। এই উদ্দেশ্যে প্রতিবিপ্লব যেকোনো উপায়ে নিপীড়িত শ্রেণীগুলির

পঙ্‌ক্তিতে ভাঙন আনার চেষ্টা করে, প্রতারণা, ঘুষ, ভীতিপ্রদর্শন, মিথ্যা বাগাড়ম্বরের আশ্রয় নেয়। চেষ্টা করে অধিবাসীদের রাজনীতিতে পশ্চাৎপদ, মামুলি মনোবৃত্তির দোলায়মান স্তরকে স্বপক্ষে টানতে। প্রতিবিপ্লবী প্রভাবের উৎসের মধ্যে পড়ে পেটি-বুর্জোয়া টলায়মানতা, প্রতিক্রিয়ার আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, নিজেদের হাতে থেকে যাওয়া ধনসম্পদ, শিল্প, প্রশাসন, সংবাদ ব্যবস্থা, সামরিক মহলের সুশিক্ষিত দক্ষ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সম্পর্ক।

বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রতিবিপ্লবী শক্তিরা সাধারণত নির্ভর করে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার ওপর। আমাদের কালে বিশ্ব প্রতিবিপ্লবের ঘাঁটি হল সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদের শক্তিগুলি বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিরোধিতা করে চলেছে একরোখার মতো। এই উদ্দেশ্যে তারা প্রতিবিপ্লব রপ্তানির আশ্রয় নেয় অম্লানবদনে।

প্রতিবিপ্লব রপ্তানি বলতে বোঝা হচ্ছে যেসব দেশ সুগভীর সামাজিক পুনর্গঠনের পথ নিয়েছে, সেখানে বলপ্রয়োগে পুরনো পুঁজিতান্ত্রিক অথবা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া মহলগুলির ক্রিয়াকলাপ। এ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ আন্তর্জাতিক আইনের সর্বস্বীকৃত মান ও নীতিগুলিকে পদদলিত করে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবিপ্লব রপ্তানির বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর সংগ্রাম চালায়, আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে যেসব জনগণ, সর্বোপায়ে পেছনে দাঁড়ায় তাদের।

প্রতিবিপ্লবের প্রহরণী শক্তি ছিল এবং আজো রয়ে গেছে ফ্যাসিজম। পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের যুগে ফ্যাসিস্ট কু'দেতা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা সচরাচর ঘটনা। এরূপ ওলটপালট ঘটতে পারে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সংবিধান লঙ্ঘন করে সশস্ত্র উপায়ে। ঠিক তাই ঘটেছিল চিলিতে ১৯৭৩ সালে যখন জাতীয় ঐক্যের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। তবে যেখানে সম্ভব সেখানে নিজেদের প্রতিবিপ্লবী লক্ষ্য সাধনের জন্য ফ্যাসিস্টরা সেখানে পার্লামেণ্টী প্রতিষ্ঠানকেও কাজে লাগায়। ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে হিটলারীরা ক্ষমতায় আসে রাইখ্স্টাগের (পার্লামেণ্টে) নির্বাচনে জয়লাভের পর।

ইদানীং পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির রাজনৈতিক বিকাশ থেকে দেখা যাচ্ছে যে মূলত ফ্যাসিস্ট প্রকৃতির আন্দোলনকে নির্মূল করতে সাম্রাজ্যবাদীরা কোনো ক্রমেই আগ্রহী নয়। সর্বোপায়ে তারা এদের বাঁচিয়ে রাখে, পোষণ করে, ভেক ধরতে দেয়। সাম্রাজ্যবাদীর কাছে প্রয়োজনের মুহূর্তে ফ্যাসিস্ট সংগঠনগুলির প্রতিক্রিয়াশীল ক্রিয়াকলাপ পুনরুজ্জীবনের জন্য সবকিছু করা হয়। আর কোনো একটা দেশে যদি বিপ্লব ঘনায়, তাহলে ফ্যাসিস্টদের ক্ষমতায় আসায় প্রাণপণে সাহায্য করে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া।

এদিক থেকে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হল লাতিন আমেরিকার দেশেরা। এখানে একদিকে শ্রেণী সংগ্রাম তেতে উঠেছে প্রচণ্ড, বৈপ্লবিক জোয়ার দেখা যাচ্ছে, অন্যদিকে স্বহস্তে ক্ষমতা ধরে রেখে প্রতিক্রিয়াশীল আমল চালিয়ে যাবার জন্য ক্রমেই বেশি করে ফ্যাসিস্ট

পদ্ধতির আশ্রয় নিচ্ছে শোষক শাসক শ্রেণীরা। এইভাবে অতি স্পষ্টাকারে প্রকাশ পাচ্ছে বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবীর শক্তির মধ্যে দ্বৈরথ। প্রথমটার রূপায়ণ হতে পারে কিউবা আর নিকারাগুয়া, আর মূর্তিমান ফ্যাসিস্ট শক্তি হল দৃষ্টান্তস্বরূপ চিলির রাজনৈতিক আমল।

লাতিন আমেরিকার অধিপতি শ্রেণীরা সর্বোপায়ে জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলন দমনের প্রয়াসে ফ্যাসিস্ট পদ্ধতির আশ্রয় নিলেও দমন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে সামরিক-ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বের বিরুদ্ধে একরোখা, প্রায়শই দীর্ঘ সশস্ত্র সংগ্রামে গড়ে উঠছে বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপের (শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, শহরের মাঝারি স্তর) ব্যাপক ফ্যাসিস্টবিরোধী জোট, এইসব গ্রুপের প্রতিনিধি রাজনৈতিক পার্টিগুলির মধ্যে সহযোগিতা চলছে। এই সহযোগিতায় অংশ নিচ্ছে কেবল কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক পার্টিগুলিই নয়, কেবল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ও ক্রিশ্চিয়ান-ডেমোক্রাটিক পার্টির র‍্যাডিকেল অংশরাই নয়, জনগণের নিচুতলার সঙ্গে জড়িত ক্যাথলিক চার্চের লোকেরাও।

২। সামাজিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক টাইপ

কোন ব্যবস্থা ধ্বংস পাচ্ছে, কী তার জায়গায় আসছে সেই অনুসারে সামাজিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক টাইপগুলির মধ্যে পার্থক্য করা হয়। বিপ্লবের টাইপের

কথায় আমরা সর্বদাই বলি এটা কোন শ্রেণীর বিপ্লব, কার স্বার্থ তা সাধন করছে।

ইতিহাসে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম বদল হয় **আদিম ব্যবস্থা থেকে দাসমালিক ব্যবস্থায় উত্তরণে**। এ উত্তরণের স্বকীয়তা হল এই যে তাতে সূচিত হয় প্রাক্‌শ্রেণী ব্যবস্থার স্থলে শ্রেণী ব্যবস্থার আগমন। আদিম ব্যবস্থার গর্ভে ক্রমে ক্রমে যে শ্রেণী বিভাগ দেখা দিচ্ছিল তাতে শেষ পর্যন্ত বৈপ্লবিক ওলটপালট ঘটে, কৌলিক সম্পর্কের যে অবশেষ ছিল, তার উচ্ছেদ হল।

দাসমালিক সমাজে দাসমালিক ও দাসেদের মধ্যে মূল বৈরবিরোধের সঙ্গে সঙ্গে ছিল বৃহৎ ভূস্বামী, কুসীদজীবী আর ছোটো চাষি, কারুজীবীদের মধ্যে বিরোধ। তা থেকে দেখা দেয় কৃষক ও অন্যান্য ছোটো ব্যক্তিমালিকদের বৈপ্লবিক আন্দোলন।

দাসমালিক সমাজে বৈপ্লবিক আন্দোলনের আরেকটা ধারা হল নিজেদের উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে দাসেদের সংগ্রাম। দাসদের বড়ো বড়ো অভিযান সাধারণত মিলিত হত গরিবদের সংগ্রামের সঙ্গে। এইসব বৈপ্লবিক আন্দোলনে বিদীর্ণ হয় দাসমালিক ব্যবস্থা।

দাসমালিক ব্যবস্থা থেকে সামন্ততন্ত্রে উত্তরণ ঘটে পুরনো সমাজের উপাদানগুলির ক্রমশ শুকিয়ে মরা আর নতুন উপাদান গড়ে উঠতে থাকার মাধ্যমে। কিন্তু এটাও ছিল বিপ্লব, কেননা ব্যবস্থার বদল ঘটল। উল্লেখ করা দরকার যে সামন্ততন্ত্রে উত্তরণ ঘটে কেবল দাসমালিক ব্যবস্থার পর্যায় দিয়ে নয়। অধিকাংশ জনগোষ্ঠী সমাজব্যবস্থা হিসেবে দাসপ্রথার কথা জানত

না, আদিম সমাজ থেকে তারা সরাসরি চলে আসে সামন্ততন্ত্রে, কিন্তু তাতে অগ্রগতিমূলক বিকাশ — নিচু থেকে উচ্চ পর্যায়ে মানবসমাজের সুসঙ্গত ঊর্ধ্বারোহণের ধারণাটা কোনোমতেই খণ্ডিত হয় না।

কৃষকদের বৈপ্লবিক আন্দোলন দাস আন্দোলনের চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ে পেঁছিয়, কিন্তু তাদেরও দুর্বলতা হল স্বতঃস্ফূর্তি. সংগঠনশীলতার অভাব। সামন্ততান্ত্রিকের স্থলে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা আসার সময় তখনো হয় নি। এমন শ্রেণী ছিল না কৃষকদের যা সঙ্গে টানতে পারে। সামন্ততন্ত্রের সবচেয়ে দৃঢ় বিরোধিতা কেবল নিপীড়িত কৃষক নয়, শহরের নিচুতলা — ওস্তাদ কারিগরদের যোগাড়ে, শিক্ষানবিশ, কাঙালদের আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িত। তবে কৃষকদের নেতৃত্ব নেবার পক্ষে শহরের গরিবেরা ছিল খুবই দুর্বল, অসংগঠিত।

তেমন শ্রেণী কেবল তখনই দেখা দিল যখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গর্ভে বিকশিত হতে থাকে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক, যখন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা উৎপাদনী শক্তি বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল, গভীর সংকটের মধ্যে পড়ল। এই সময় (কালপঞ্জির দিক থেকে বিভিন্ন দেশে তা সমকালীন নয়) থেকে উঠতে থাকে বুর্জোয়া বিপ্লবের পূর্বশর্ত।

বুর্জোয়া বিপ্লব হল **সামন্ততান্ত্রিক থেকে পুঁজিতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণ.** যা ঘটে নির্মম শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে।

বুর্জোয়া বিপ্লবের অবজেকটিভ পূর্বশর্ত হল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গর্ভে উৎপাদন প্রণালীতে

র‍্যাডিকেল পরিবর্তন (উৎপাদনী শক্তির যথেষ্ট বৃদ্ধি, বুর্জোয়ার অর্থনৈতিক শক্তির সংহতি ইত্যাদি)। মুনাফা অর্জনের জন্য উৎপাদন বিকাশের যে তাগিদ, তাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় আবশ্যক হয়ে ওঠে বুর্জোয়ার পক্ষে, এ ক্ষমতা তারা পরে প্রয়োগ করে গোটা সমাজব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থে ঢেলে সাজার হাতল হিশেবে।

বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রস্তুতি প্রক্রিয়ায় ও গতিপথে বুর্জোয়ার পক্ষে যায় ন্যূনাধিক ব্যাপক শোষিত জনগণ, যারা ছিল নতুন সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী, যা তাদের দেবে অপেক্ষাকৃত বেশি মুক্তি ও স্বাবলম্বন।

বিপ্লব হয় ততই সঙ্গতিপরায়ণ ও র‍্যাডিকেল যত বেশি তাতে অংশ নেয় সবচেয়ে নিপীড়িত জনগণ যারা পেশ করে এবং আদায় করতে চায় নিজস্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি। সমাজের 'নিচুতলা' যদি ঘটনাধারার ওপর নিজেদের প্রবল প্রভাব ফেলতে পারে, তাহলে বিপ্লব পরিগ্রহ করে সত্যকার জনচরিত্র। এই ধরনের বুর্জোয়া বিপ্লবকে বলা হয় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক।

ষোল শতকে পশ্চিম ইওরোপে ঘটে প্রথম দিককার তখনো অপরিণত বুর্জোয়া বিপ্লব। পুঁজিতন্ত্রের যুগ সূচিত হয় যে বিপ্লবে, সেটা হল ইংলণ্ডে সতের শতকের বিপ্লব। তা ঘটার পেছনে একটা কারণ ছিল মেহনতী জনগণের, সর্বত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত ও জমি থেকে বিতাড়িত কৃষকদের দুরবস্থা।

ক্লাসিকাল বুর্জোয়া বিপ্লব (সংগ্রামের রূপ,

ঘটনাবলির প্রসার, মেহনতিদের অংশগ্রহণের মাত্রা, সবদিক থেকেই) ১৭৮৯-৯৪ সালের মহান ফরাসি বিপ্লব। মূল তাৎপর্যের দিক থেকে এটা ছিল প্রবল গণ আন্দোলনগুলির সামূহিক পরিণতি ও অভিব্যক্তি। তাই প্রথম ধাক্কাটার পর ক্ষমতায় এসে যাওয়া বৃহৎ বুর্জোয়ার পক্ষ থেকে জনগণকে 'শান্ত' করার চেষ্টা হয়, সেটা অকারণে হয়। এই প্রয়াসই প্রকাশ পেয়েছে ১৭৮৯ সালের 'মানুষ ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণা'তে যা সকলের সমাধিকার ঘোষণা করে। কিন্তু অবজেকটিভ কারণেই ধনী দরিদ্রে সমাজের ভাগাভাগি মুছে ফেলা বিপ্লবের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার পতাকায় লেখা ছিল: 'ব্যক্তিগত মালিকানা অলঙ্ঘনীয়'।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল শ্রেণী সমাজের ইতিহাসে সবচেয়ে সুগভীর ওলটপালট, পুঁজিতান্ত্রিক থেকে কমিউনিস্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণের উপায়।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার চূড়ান্ত পুনর্গঠনের পুরো একটা যৌগিক ব্যাপার।

— মেহনতিদের অন্যান্য স্তরের সঙ্গে সহযোগে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা অধিকার;

— পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা;

— উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা স্থাপন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়াদির সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গঠন;

— যেকোনো রূপের শোষণ ও পীড়নের মূলোৎপাটন;
— শ্রেণীবৈরের উচ্ছেদ;
— সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশ;
— সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

অন্যান্য ধরনের সামাজিক বিপ্লবে শোষণের রূপ বদলেছে, কিন্তু তার গভীর মূল, উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানাকে তা স্পর্শ করে নি. শোষণ ব্যবস্থারই অবসান ঘটায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্থনৈতিক ভিত্তি হল উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আর পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানার মধ্যে সংঘাত। সমাজের উৎপাদনী শক্তির বিপুল বৃদ্ধি, ক্রমেই বেশি করে তার সামাজীকরণ, উদ্যোগাদি, উৎপাদনের শাখা, বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নিবিড় সংযোগ ইত্যাদি পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে আঁটে না।

উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আর আত্মসাৎ করার পুঁজিতান্ত্রিক রূপের মধ্যে বিরোধ হল শ্রম আর পুঁজি, প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়ার মধ্যে বৈরিতার উৎস। পুঁজিতন্ত্রে শ্রমিক শ্রেণী হল প্রধান উৎপাদনী শক্তি, বৃহৎ উৎপাদনের সঙ্গে তারা অঙ্গাঙ্গি সংশ্লিষ্ট। বৈষয়িক সম্পদ সৃষ্টিতে নির্ধারক ভূমিকা পালন করলেও তার বিলিব্যবস্থার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। উৎপাদনী সম্পর্কের ব্যবস্থায় নিজেদের অবস্থানের দরুন প্রলেতারিয়েত এগিয়ে আসে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান চালিকা শক্তি হিশেবে। পুঁজিতন্ত্রে শ্রম ও

জীবনের পরিস্থিতিই তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দৃঢ়তা, সাহস, সংগঠনশীলতা, যৌথতা, সহ্যশক্তি, অর্থাৎ এমন বৈপ্লবিক গুণ যা পুঁজিতন্ত্রের উচ্ছেদ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের জন্য আবশ্যক।

একচেটিয়া পুঁজির বর্ধমান পীড়ন সইতে হয় পূর্বতন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে রয়ে যাওয়া শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপদের: কৃষক, কারুজীবী, কুটিরশিল্পীদের, তথা নতুন সামাজিক গ্রুপদেরও (কর্মচারী, ইঞ্জিনিয়ারিং-টেকনিকাল কর্মী, ছোটো ছোটো শ্রমোদ্যোক্তা)। নিজেদের অবস্থান হেতু তাদের অনেকেই শ্রমিক শ্রেণীর কাছাকাছি এসে যাচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য হতে পারে তার সহযোগী। মেহনতিদের অপ্রলেতারীয় স্তরের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর মৈত্রী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের অপরিহার্য শর্ত।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাবজেকটিভ কারিকা প্রস্তুতির প্রক্রিয়ায় বিপুল ভূমিকা বর্তায় শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক পার্টির ওপর। এ পার্টি শ্রমিক আন্দোলনে সঞ্চার করে সমাজতান্ত্রিক চেতনা, জনগণকে শিক্ষিত ও সংগঠিত করে তোলে, শ্রেণী সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশল প্রণয়ন করে, নিশ্চিত করে বৈপ্লবিক আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিচালনা।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম কাজ হল শ্রমিক শ্রেণী ও তার সহযোগীদের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের বিচূর্ণন, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব স্থাপন। মূর্তনির্দিষ্ট অবস্থা অনুসারে

ক্ষমতা দখলের রূপ হতে পারে বিভিন্ন।

শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা দখল করতে পারে যেমন শান্তি, তেমনি অশান্তির পথেও। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথগ্রহণ আবশ্যিক ও ন্যায়সঙ্গত হয় যখন সমাজতন্ত্রের পক্ষে অধিকাংশ জনগণকে টেনে আনার শান্তিপূর্ণ পথ অধিপতি শ্রেণীরা বন্ধ করে দেয়, দমন করে বৈপ্লবিক অগ্রবাহিনীর ক্রিয়াকলাপ। এক্ষেত্রে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সাফল্যের ভরসা করতে পারে দেশব্যাপী সংকটের পরিস্থিতিতে যখন অধিকাংশ জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন তার জন্য নিশ্চিত। শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক শান্তির পথে ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা দেখা দেয় যখন অধিপতি শ্রেণীদের পক্ষে প্রতিকূল শক্তি অনুপাতের দরুন তারা জনগণের ওপর খোলাখুলি বলপ্রয়োগ করতে পারে না অথবা সাহস পায় না।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমেত অন্যান্য পুনর্গঠনের চেয়ে রাজনৈতিক পুনর্গঠনই গ্রহণ করে প্রধান ভূমিকা, তার কারণ পুঁজিতন্ত্রের কোনো বিরোধই আপনা থেকে বিলুপ্ত হয় না। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় সবচেয়ে বিপ্লবী এবং শেষাবধি সঙ্গতিপরায়ণ শ্রেণী, প্রলেতারিয়েত অর্থাৎ পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগাদিতে মজুরি খাটা শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বাস্তব ক্রিয়াকর্ম।

তার কারণ নিজেদের অবজেকটিভ অবস্থা হেতু কেবল প্রলেতারিয়েতই বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এমন এক শক্তি রূপে যা সমাজতান্ত্রিক প্রেরণায় সমাজ

পুনর্গঠনে সক্ষম, সেটা এই জন্য: প্রলেতারিয়েত সমাজের প্রধান উৎপাদনী শক্তি, নিজের প্রকৃতিবশেই ব্যক্তিগত মালিকানা প্রলেতারিয়েতের কাছে বিজাতীয়, একই সঙ্গে গোটা সমাজকে মুক্ত না করে প্রলেতারিয়েত নিজের মুক্তি অর্জন করতে পারে না। প্রলেতারিয়েত ও সমস্ত মেহনতী জনগণকে মুক্ত করা যায় না সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বের অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন বাস্তবে কার্যকৃত করার জন্য, তথা সত্যকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার থিসিস। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব হল শোষকদের প্রতিরোধ দমন, সমাজতন্ত্র নির্মাণ ও সংহত করার লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গতিপথে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভুত্ব। এ প্রভুত্ব খাটানো হয় রাষ্ট্র, কমিউনিস্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, জনফ্রন্ট এবং মেহনতিদের অন্যান্য সংগঠন মারফত।

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রথম কথা ঠিক একনায়কত্ব হিশেবেই এটা হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরোধী, সমস্ত শত্রুভাবাপন্ন সামাজিক শক্তির ক্ষেত্রে বাধ্যকরণ ব্যবস্থার প্রয়োগ। শত্রু শ্রেণীগুলির পক্ষ থেকে প্রতিরোধের তীব্রতা ও রূপ অনুসারে দমনের নানান পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাষ্ট্র। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপাট যত সুদৃঢ় হয়, শ্রেণী প্রতিপক্ষকে দমনের কম কঠোর উপায় অবলম্বনের সুযোগও তত বাড়ে।

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের দ্বিতীয় কথা হল অপ্রলেতারীয় মেহনতী জনগণের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর মৈত্রী। এ মৈত্রী সম্ভব এবং আবশ্যক কারণ এইসব শ্রেণী ও স্তরের স্বার্থ মিলে যায়। শ্রেণী জোট হতে পারে কম বা বেশি ব্যাপক, অপ্রলেতারীয় মেহনতি জনগণের বৃহৎ বা অতিবৃহৎ অংশ আসতে পারে তাতে।

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রূপ হতে পারে নানা রকমের। মেহনতিদের অপ্রলেতারীয় জনগণের সহযোগে শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা যেসব রাজনৈতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানাদি মারফত বলবৎ হয়, সর্বাগ্রে তাই দিয়েই এই রূপগুলির পার্থক্য।

ইতিহাসের দিক থেকে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রথম রূপ ছিল প্যারিস কমিউন (১৮৭১)। স্বল্পস্থায়ী হলেও শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা সংগঠনের অনেকগুলি সাধারণ দিক তাতে প্রকাশ পেয়েছিল।

রাশিয়ায় শ্রমিক একনায়কত্বের রূপ দাঁড়িয়েছিল শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত বা পরিষদ। তাতে সরাসরি মূর্ত হয়েছিল মেহনতী কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিকদের জোট, মৈত্রী। এক্ষেত্রে সমস্ত মেহনতী শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছিল কেবল একটি পার্টি -- কমিউনিস্ট পার্টি। এ পার্টি যেমন শ্রমিকদের তেমনি কৃষকদের দাবি কার্যকৃত করে। পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলি জনগণের মধ্যে তাদের নৈতিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা হারায়, তারা এদের আর সমর্থন করে না। এই থেকেই এসেছে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের

সোভিয়েত রূপের বৈশিষ্ট্য — যেমন, এক পার্টি প্রথা, প্রতিবিপ্লবের দলে ভেড়া পার্টিগুলির সঙ্গে তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রাম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপের কতকগুলি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গতিপথে যে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটা হল প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আরেকটা রূপ। তার বৈশিষ্ট্য হল একাধিক পার্টির অস্তিত্ব, অপ্রলেতারীয় পার্টি ও রাজনৈতিক গ্রুপগুলির সঙ্গে প্রলেতারিয়েত ও তার পার্টির সহযোগিতা। সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী আর মেহনতিদের অপ্রলেতারীয় জনগণের রাজনৈতিক জোটের রূপ এখানে হয় জন ফ্রন্ট ধরনের সংগঠন।

কিউবায় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের বৈশিষ্ট্য হল সমাজতন্ত্র নির্মাণের মঞ্চে সমবেত সমস্ত বৈপ্লবিক শক্তির সরাসরি মিলন এবং এই ভিত্তিতে এক পার্টি প্রথার প্রবর্তন।

ভবিষ্যতে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের অন্য রূপও সম্ভব।

শোষক শ্রেণীগুলির প্রতিরোধ দমন হল প্রলেতারীয় একনায়কত্বের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। কিন্তু তার প্রধান কাজ হল সৃজন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ। এটা মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন কেননা কিছু কিছু বুর্জোয়া ভাবাদর্শী প্রলেতারীয় একনায়কত্বকে কেবলমাত্র বলপ্রয়োগ বলে দেখাতে চায়।

সমাজতন্ত্রের বিরোধীরা প্রলেতারীয় একনায়কত্ব আর গণতন্ত্রকে পরস্পরের নাকচ বলে ধরে। তারা দাবি করে

যে একনায়কত্ব মানে গণতন্ত্র লোপ, লোকেদের ওপর বলপ্রয়োগ। শোষকদের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সংকোচনকে তারা গণতন্ত্রের বিলোপ বলে চালিয়ে দেয় এবং 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্র', সকলের জন্য গণতন্ত্রের ধ্বজা ধরে।

কিন্তু সাধারণভাবে গণতন্ত্রের কথা বলার অর্থ শ্রেণী সংগ্রাম ভুলে যাওয়া। গণতন্ত্রের মর্মার্থ নির্ধারিত হয় ক্ষমতার শ্রেণী চরিত্রে, অর্থাৎ ক্ষমতা কার হাতে, কাদের স্বার্থে তা খাটছে তাই দিয়ে। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব শোষক শ্রেণীদের প্রভুত্ব খতম করে সত্যকার জনক্ষমতার যুগ এনে দেয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ে এই প্রথম রাষ্ট্রের লাগাম ধরে মেহনতিরা, প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজের অল্পাংশের ওপর অত্যধিকাংশের ক্ষমতা। তাই প্রলেতারীয় গণতন্ত্র সর্ববিধ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চেয়ে অতুলনীয় গণতান্ত্রিক।

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ একটা বিশ্ব প্রক্রিয়া, তা বেড়ে ওঠে বিশ্ব ব্যবস্থা রূপে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধ থেকে। তবে পুঁজিতন্ত্র বিকাশের গতিপথে এই বিরোধগুলি সমানভাবে বিকাশ পায় না। প্রথমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়লাভ করে পৃথক একটি দেশ রাশিয়ায়, বিশ শতকের গোড়ায় যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার সবচেয়ে দুর্বল গ্রন্থি। ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব হল প্রথম বিজয়ী প্রলেতারীয় বিপ্লব। পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যে যুগ তার সূচনা করে এই বিপ্লব, বিদীর্ণ করে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অটলতা আর প্রাণশক্তি। পুঁজিতন্ত্র প্রবেশ করল তার সাধারণ

সংকটের পর্বে, যা ব্যাপ্ত তার সবদিকে — অর্থনীতি, রাজনীতি, ভাবাদর্শে। নতুন সমাজব্যবস্থা যে বিদ্যমান এই ঘটনাটাই শোষক সমাজের ভিত্তি টলিয়ে দিল, সমস্ত দেশেই বিপ্লবী করে তুলল মেহনতিদের।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য শুধু এই নয় যে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এমন সব সাধারণ নিয়মবদ্ধতাও প্রকাশ পেয়েছে তাতে, যা স্বকীয় রূপে অন্যান্য দেশেও দেখা দিতে বাধ্য। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর ইওরোপ ও এশিয়ায় আরো একগুচ্ছ দেশ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা থেকে খসে যায়। পরে জয়লাভ করল কিউবার বিপ্লব, আমেরিকা মহাদেশে সেই প্রথম।

তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটা বিশ্ব প্রক্রিয়া। মর্মবস্তু ও চরিত্রের দিক থেকে নানা রকমের বিপ্লব তার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। তার কতকগুলি এমনিতে সমাজতান্ত্রিক নয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের খুঁটি ধ্বসিয়ে তা বয়ে যাচ্ছে **একক বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার** সাধারণ খাতে। তার এক-একটা খণ্ডে থাকে নিজস্ব বিশিষ্ট কর্তব্য, দেখা দেয় নিজস্ব দুরূহতা, সমস্যা। সেইসঙ্গে সমস্ত বৈপ্লবিক শক্তি ইতিহাসের বিধানে মিলিত হচ্ছে সেই শ্রেণীটিকে ঘিরে যা দণ্ডায়মান বর্তমান যুগের কেন্দ্রে — আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী।

বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিকাশ থেকে দেখা যাচ্ছে যে সরাসরি কেবল পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে নয়, পুঁজিতন্ত্র এড়িয়ে প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক পর্যায় থেকেও

সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব। মঙ্গোলিয়া গণ-প্রজাতন্ত্র, ভূতপূর্ব রুশ সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত জাতিগুলির অভিজ্ঞতা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলিতে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক ও ভাবাদর্শীয় প্রক্রিয়া চলেছে সেটা মূলত পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ পূর্বশর্ত সৃষ্টি নিয়ে। এইসব দেশে সামাজিক পুনর্গঠনের কতকগুলি দিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রক্রিয়ায় কার্যকৃত পুনর্গঠনের অনুরূপ: অর্থনীতিতে জন-রাষ্ট্রের নির্ধারক ভূমিকার সংহতি, সমবায় আন্দোলনে উৎসাহ দান, ব্যাপক জনগণের স্বার্থে সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বহির্নীতি। অপুঁজিতান্ত্রিক পথে বিকাশের জটিলতা ও দুরূহতা বৃদ্ধি পায় সরাসরি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পভিত্তি না থাকায়।

৩। জাতীয় মুক্তি বিপ্লব

বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার একটি অঙ্গ হল জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে ক্রমবর্ধমান শক্তিতে তা ছড়িয়ে পড়েছে প্রাক্তন ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দুনিয়ার বিরাট অঞ্চলে। গতকালও যারা ছিল ঔপনিবেশিক নিগড়ে আবদ্ধ, সেইসব জনগণ উঠে দাঁড়িয়েছে জাতীয় স্বাধীনতা ও অগ্রগতির পথে।

উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের জনগণ পীড়ন কখনো মেনে নিতে পারে নি। আত্মত্যাগ করে তারা লড়েছে উপনিবেশ মালিকদের বিরুদ্ধে, এগিয়ে দিয়েছে মুক্তি ও স্বাধীনতার হাজার হাজার নির্ভীক যোদ্ধাকে। কিন্তু শক্তি ছিল অসমান, উপনিবেশ মালিকদের সমরযন্ত্র নির্মমভাবে দমন করেছে গণ অভ্যুত্থান।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের অবস্থানকে বিদীর্ণ করে, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মুখ ফিরিয়ে দেয়। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা প্রবেশ করল গভীর সংকটের পর্বে। জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জোয়ারে প্রবল প্রেরণা দিয়েছিল: সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয়, সামাজিক ও জাতীয় পীড়ন থেকে এদেশের অধিবাসী শতাধিক জাতি ও জাতিসত্তার মুক্তি লাভের ক্ষেত্রে সোভিয়েত অভিজ্ঞতা; দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে জার্মান ফ্যাসিজম ও জাপানি সমরবাদের পতন; একসারি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় ও সমাজতন্ত্র গঠন; পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলনের বৃদ্ধি। নিপীড়িত জনগণের সংগ্রাম অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পায়। নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে অক্ষম হয় সাম্রাজ্যবাদ, **জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের** আঘাতে তা ভেঙে পড়ল। যুদ্ধোত্তর কালে ভূতপূর্ব উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির জায়গায় দেখা দিল প্রায় ১০০টি নবীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।

উপনিবেশ মালিকদের কবল থেকে জনগণ তাদের জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধার করে সুদীর্ঘ একরোখা

সংগ্রামে। কতকগুলি ক্ষেত্রে তা ছিল সশস্ত্র অভিযান, যাতে দেশভক্তরা অপূর্ব বীরত্ব আর বৈপ্লবিক সংকল্পের দৃষ্টান্ত রাখে। একসারি ঔপনিবেশিক ও পরনির্ভর দেশে, যেমন ভিয়েতনাম, কোরিয়া, আলজেরিয়া, কিউবা, গিনি-বিসাউ, মোজাম্বিক, আঙ্গোলা, নিকারাগুয়ায় এই অভিযান পরিবর্কশিত হয় জাতীয় মুক্তি যুদ্ধে।

অন্য অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সশস্ত্র অভিযানে পরিনত না হলেও উপনিবেশ মালিকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামের চরিত্র ধারণ করে যাতে যোগ দেয় ব্যাপক জনগণ।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ধ্বংস, ভূতপূর্ব ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ — এ হল ভূমণ্ডলের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসীর জীবনে এক প্রগাঢ় বৈপ্লবিক বাঁক। বিপুল ঐতিহাসিক গুরুত্বের ঘটনা এটা, সমগ্র মানবজাতির এক মহান অর্জন।

বৈজ্ঞানিক বিচারে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবগুলির ঐতিহাসিক স্থান নির্দেশ করে মার্কসবাদই প্রথম। তা দেখায় যে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণী সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত, জাতীয় পীড়ন পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্যসূচক দিক, এ পীড়নের মূল নিহিত ব্যক্তি-মালিকানা সম্পর্কে, যা দিয়ে নির্ধারিত হয় শোষক শ্রেণীগুলির স্বার্থ ও পলিসি।

গোলাম জাতিগুলির জাতীয় মুক্তি সমাজতন্ত্রের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত।

এইসব দেশের মুক্তি আন্দোলন সর্ববিধ জাতীয় ও ঔপনিবেশিক পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাভাবিক মিত্র।

কেবল বিশ্ব সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগেই জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করতে পারে। বর্তমান পর্যায়ে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চালিত। সেই সঙ্গে অধিকাংশ দেশে তা সামন্ততান্ত্রিক এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে প্রাক্‌সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের বিরুদ্ধেও চালিত, যেগুলির পোষকতা করে সাম্রাজ্যবাদ।

ভূতপূর্ব ঔপনিবেশিক ও পরনির্ভর দেশগুলির শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভেরও কর্তব্য গ্রহণ করে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলেও এ দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্তি পায় না। বিদেশী একচেটিয়ারা সাধারণত তাদের অর্থনৈতিক জীবনের ওপর পূর্ণ বা আংশিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ ও শোষণের এই ব্যবস্থাই জাতীয় মুক্তি বিপ্লবগুলির সামনে উপস্থিত করে অর্থনৈতিক শৃংখল মোচনের কর্তব্য।

জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের গতিপথে ভূতপূর্ব উপনিবেশ ও পরনির্ভর দেশগুলির বিকাশের পথ নির্বাচনেরও প্রশ্ন আসে। গত যুগে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবগুলি হত হয় বুর্জোয়া নয় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক। বর্তমানে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে উত্তরণের পূর্বশর্ত নির্মাণে এগুতে পারে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব। আগে সম্ভব ছিল কেবল একটা পথ — পুঁজিতান্ত্রিক।

বর্তমানে সম্ভব বিকাশের দুটি ধারা — সমাজতন্ত্রের দিকে অথবা পুঁজিতন্ত্রের দিকে।

জাতীয় মুক্তি বিপ্লব রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেই শেষ হয় না। এ স্বাধীনতা হবে নড়বড়ে, পরিণত হবে অলীকতায় যদি বিপ্লব সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে প্রগাঢ় পরিবর্তন না ঘটায়, জাতীয় নবজাগ্রতির জরুরি কর্তব্য পালন না করে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে যেসব দেশ, সেখানে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব প্রবেশ করছে একটা নতুন পর্যায়ে — অর্থনৈতিক মুক্তি এবং তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রিক স্বাবলম্বনের জন্য, সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রামের পর্যায়। এ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল জাতীয় মুক্তির সঙ্গে ক্রমশ সামাজিক পুনর্গঠনের কর্তব্য জুড়ে যাওয়া, এর ভূমিকা অবিরাম বেড়ে উঠছে। তার মানে মোটেই এ নয় যে উপনিবেশবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম নিবে যাচ্ছে। না, তার তাৎপর্য বজায় থাকছে।

সদ্যোমুক্ত দেশগুলির রাজনৈতিক স্বাধীনতা আর সাম্রাজ্যবাদের নিকট অর্থনৈতিক অধীনতার মধ্যে তীব্র বিরোধে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের সংঘাত বেড়ে ওঠে, উত্থিত হয় তারা সংগ্রামে। ৭০-এর দশকের ঘটনাবলিতে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। তাদের অর্থনৈতিক জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদের একগুঁয়ে প্রচেষ্টার মুখে পড়ে উন্নয়নশীল দেশগুলি দৃঢ়সংকল্প ব্যবস্থার পথ নেয়। অনেক উন্নয়নশীল দেশে বিদেশী কোম্পানির সম্পত্তির জাতীয়করণ হয়েছে। তার লক্ষ্য উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রাকৃতিক

সম্পদের ওপর তাদের নিজস্ব সার্বভৌমত্ব স্থাপন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। এতেই সীমিত না থেকে সদ্যোমুক্ত দেশগুলি পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে নিজেদের অর্থনৈতিক সম্পর্কের একেবারে অন্যরকম ব্যবস্থার জন্য, সমাধিকার ও পারস্পরিক সুবিধার নীতিতে সেগুলি পুনর্বিচারের জন্য জেদ করছে।

রাষ্ট্রীয় সেক্টর গঠন এবং তাকে অর্থনীতির প্রধান কারিকায় পরিণত করা হল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, উৎপাদনী শক্তির বিকাশ ত্বরণ, সামাজিক প্রগতির বৈষয়িক ভিত্তি সংহতির গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

রাষ্ট্রীয় সেক্টর যদি ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগাদির লেজুড় না হয়ে সাধারণ স্বার্থের অধীনে থাকে, তাহলে তা যেমন বিদেশী একচেটিয়ার বিরুদ্ধে, তেমনি ব্যক্তিগত উৎপাদনের বিরুদ্ধে চালিত প্রবল এক সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারিকা হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সেক্টর হতে পারে বিকাশের অপুঁজিতান্ত্রিক পথে উত্তরণে প্রগতিশীল সরকারের বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক রাজনীতির ঘাঁটি।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য, সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে পরিপূর্ণ মুক্তির জন্য সংগ্রামে বিপুল গুরুত্ব ধরে **কৃষির পুনর্গঠন।**

কৃষকেরা কার পেছনে যাবে, তার ওপর বহু পরিমাণে নির্ভর করে সদ্যোমুক্ত দেশ কোন পথ নেবে। এক-একটা দেশের বিশেষত্ব অনুসারে কৃষি সমস্যার সমাধান হতে পারে বিভিন্ন। তবে সাধারণ কথাটা হল এই — গণতান্ত্রিক শক্তিরা কৃষির পুনর্গঠন চায় কৃষকদের অংশ

গ্রহণে এবং তাদের স্বার্থ, ভূমির ওপর জমিদারি মালিকানা, বিদেশী ভূসম্পত্তি, সামন্ততান্ত্রিক ও প্রাক্‌সামন্ততান্ত্রিক জেরের বিলোপ, প্রদত্ত জমি হাসিল করার জন্য মেহনতী কৃষকদের সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় সাহায্যের দাবি করে। সত্যকার গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে যদি কৃষি সমবায় বিকশিত হয়, তাহলে গ্রামের অপুঁজিতান্ত্রিক পথে উত্তরণের পূর্বশর্ত গড়ে ওঠে।

বিপ্লবের নতুন পর্যায়ে সাধারণ গণতান্ত্রিক কর্মসূচির অঙ্গ হল **সমাজজীবনের গণতন্ত্রীকরণ**। এ কর্মসূচির মধ্যে থাকে: ঔপনিবেশিক প্রশাসন যন্ত্রের বিচূর্ণন; রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্থাগুলিতে ব্যাপক জনপ্রতিনিধিত্ব; প্রতিক্রিয়ার শক্তি দমন; ট্রেড-ইউনিয়ন, কৃষক ও অন্যান্য গণসংগঠনগুলির স্বীকৃতি ও অধিকার প্রসার। সাধারণ গণতান্ত্রিক কর্মসূচির একটা আবশ্যিক দিক হল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সক্রিয় বহির্নীতি, জাতিসমূহের শান্তি ও নিরাপত্তার সংহতি, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সহযোগিতার জন্য সংগ্রাম।

যেসব সদ্যোমুক্ত দেশে ক্ষমতায় থাকে জাতীয় বুর্জোয়া, সেখানে তারা বিপ্লবের বিকাশ আটকে রাখার চেষ্টা করে।

সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া এখানে সাধারণত তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখে। জাতীয় অর্থনীতি গঠনের হাতিয়ার হিশেবে রাষ্ট্রীয় সেক্টরের ভূমিকা এখানে এতটা খাটো করা হয় যাতে তা হয়ে দাঁড়ায় স্থানীয় বুর্জোয়ার স্বার্থাধীন, যারা প্রায়শই বিদেশী

পুঁজির বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর অভিযান চালাতে গররাজি।

যেসব দেশ বিকাশের পুঁজিতান্ত্রিক পথ নেয়, সেখানে প্রধান যে প্রশ্ন, ভূমির প্রশ্ন, তার সমাধান হয় না কৃষকদের স্বার্থে। যে ভূস্বামীরা চাষের পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলে আসে, তাদের হাতে থেকে যায় আবাদী জমির বড়ো একটা ভাগ, কখনো কখনো তার মূল্যাংশই। কৃষকদের ওপর চলে শোষণ, কুসীদজীবীদের স্বেচ্ছাচার।

এসব দেশের রাজনৈতিক জীবনে সত্যকার গণতন্ত্রীকরণ আর ঘটে না। ক্ষমতা থাকে সুবিধাভোগী শ্রেণীদের হাতে। প্রগতিশীল পার্টি ও সংগঠনগুলির ক্রিয়াকলাপে রাষ্ট্র বাধা দেয়, জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে যেসব শক্তি, তাদের ওপর নেমে আসে নির্যাতন।

জাতীয় বুর্জোয়া পরিচালিত কতকগুলি দেশে মেহনতিদের অবস্থা খানিকটা উন্নত হয়েছে। তবে বহু দিক থেকে আজো পর্যন্ত বজায় আছে শোষণের ঔপনিবেশিক চরিত্র। শ্রমিকদের বেতন অসাধারণ কম, প্রায়ই তাতে কেবল একটা কাঙাল জীবনধারণ সম্ভব হয়। প্রলেতারিয়েতের দুরবস্থা বেড়ে ওঠে ব্যাপক বেকারির ফলে। কারুজীবী আর ছোটা ছোটা দোকানদারদের অবস্থা মূলত বদলায় নি।

যেসব দেশে ক্ষমতায় থাকে সাম্রাজ্যবাদের মুখাপেক্ষী বুর্জোয়ারা, সেখানে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের ফলাফল আরো জাজ্বল্যমান। সেখানে বিদেশী একচেটিয়ার ওপর বর্ধমান নির্ভরতার ভিত্তিতে ক্রমেই দানা বাঁধতে থাকে নয়া-ঔপনিবেশিক ধাঁচের অর্থনীতি। ঐ একচেটিয়াগুলি

এসব দেশে কার্যত অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে, মেহনতী জনগণের শোষণ বাড়িয়ে লুটতে থাকে ক্রমবর্ধমান মুনাফা। জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের সাধারণ গণতান্ত্রিক কর্মসূচি পুঁজিতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে আঁটে না।

বিকাশের অপুঁজিতান্ত্রিক পথ পুঁজিতন্ত্রের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয় জনগণকে, নিশ্চিত করে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রগতি। পুঁজিতন্ত্র এড়িয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে এখন, যখন বিদ্যমান রয়েছে সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা, এ পথে বিকাশের অভিজ্ঞতা জমে উঠেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে এক প্রজন্মের জীবদ্দশাতেই মধ্য এশিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলি পশ্চাৎপদ আধা ঔপনিবেশিক প্রত্যন্ত থেকে পরিণত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক শিল্প-কৃষি অঞ্চলে। মঙ্গোলিয়া গণ-প্রজাতন্ত্রও বেড়ে উঠেছে অপুঁজিতান্ত্রিক পথে।

পুঁজিতন্ত্রের গর্ভে সমাজতন্ত্রের যে বৈষয়িক পূর্বশর্ত দানা বাঁধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অপুঁজিতান্ত্রিক পথে তা গড়ে তোলা হয় সচেতনভাবে, উদ্দেশ্য নিয়ে: শিল্প ও কৃষিতে গড়ে তোলা হয় আধুনিক উৎপাদনী শক্তি, পরিপক্ক হয় সত্যকার জাতীয় অর্থনীতি, শ্রমিক শ্রেণী বৃদ্ধি পায়, সমাজজীবনে তার ভূমিকা বেড়ে ওঠে, শক্তিশালী হয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অবস্থান, জাতীয় লৌকিক বুদ্ধিজীবী কর্মী গড়ে ওঠে।

জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের সাধারণ গণতান্ত্রিক কর্মসূচির এইসব আঙ্গিক দিকগুলি তার বিকাশের

উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণের শর্ত তৈরি করে দেয়।

অপুঁজিতান্ত্রিক পথে শ্রেণী শক্তির পুনর্বিন্যাস, প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক ভূমিকা ও প্রভাব বৃদ্ধির কথা ধরে নেওয়া হয়। এই পথে ক্রমশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিবিকাশ ঘটতে পারে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের।

সমাজতন্ত্রমুখিতার পথে সদ্যোমুক্ত দেশগুলির উত্তরণে সাহায্য করে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চরিত্রের নানা ব্যাপার। তার মধ্যে পড়ে: সাম্রাজ্যবাদের অবস্থানে দুর্বলতা বৃদ্ধি, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তি সংহতি, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সাহায্য; এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একাত্মতার সংহতি, শ্রমিক শ্রেণীর বৃদ্ধি; শ্রেণীগত ও জাতীয় আত্মচেতনার জোয়ার।

সদ্যোমুক্ত দেশগুলির ভবিষ্যৎ বিকাশের ধারা নির্বাচিত হয় তীব্র শ্রেণী সংঘাতের মাধ্যমে। এইসব দেশে প্রায়ই সক্রিয় থাকে এমনসব শক্তি যারা সামাজিক বিকাশ আটকে রাখে, চেষ্টা করে পুঁজিতন্ত্রকে জিতিয়ে দিতে। স্থানীয় প্রতিক্রিয়া প্রগতিশীল বিকাশের কট্টর প্রতিরোধী। তা নির্ভর করে সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় রাজনৈতিক, আর্থিক এবং প্রায়শই সামরিক সমর্থনেরও ওপর।

সমাজতন্ত্রমুখিতার পথে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া কতটা সম্ভব হবে, তা নির্ভর করে গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির শক্তিগুলি অর্থনৈতিক মুক্তির

জন্য, জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাবার জন্য সংগ্রামের গতিপথে সমাজের রাষ্ট্রিক পরিচালনায় চলে আসতে পারছে কিনা তার ওপর।

বলাই বাহুল্য, সমাজতন্ত্রমুখী রাষ্ট্রগুলির বিকাশ একই ধারায় নয়, চলে জটিল সব পরিস্থিতির মধ্যে। কিন্তু এ বিকাশের মূলধারাটা একই রকমের। তার মধ্যে পড়ে: সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া, স্থানীয় বৃহৎ বুর্জোয়া আর সামন্তদের অবস্থানের ক্রমিক উচ্ছেদ; অর্থনীতিতে জনরাষ্ট্রের আধিপত্যসূচক ঘাঁটির ব্যবস্থা এবং তার পরিকল্পিত বিকাশে উত্তরণ, গ্রামে সমবায় আন্দোলনে উৎসাহদান; সামাজিক জীবনে মেহনতী জনগণের ভূমিকা বৃদ্ধি, জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত জাতীয় কর্মচালকদের নিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্রমিক সংহতি; এসব দেশের বহির্নীতির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চরিত্র, মেহনতিদের ব্যাপক স্তরের স্বার্থ-প্রবক্তা বৈপ্লবিক পার্টির শক্তিশালিতা। সমাজতন্ত্রমুখী দেশেদের প্রগতিশীল বিকাশের জন্য এই ধরনের পার্টি গঠন বিশেষ তাৎপর্য ধরে।

সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলিকে পুঁজিতন্ত্রের পথে ফেরাবার চেষ্টা সাম্রাজ্যবাদ আর স্থানীয় প্রতিক্রিয়া ছেড়ে দেয় নি। বলপ্রয়োগে প্রগতিশীল সরকারগুলিকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে নয়া-উপনিবেশিকরা তাদের পৃষ্ঠপোষিত বুর্জোয়া-আমলাতান্ত্রিক ও দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী মহলের সাহায্যে ক্রমশ তাদের অভ্যন্তরীণ আর বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্তন ঘটাতে চেষ্টিত।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে সদ্যোমুক্ত দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ আর তার পেটোয়াদের অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকলাপ ফলপ্রদ প্রত্যাঘাত পায় এবং সামাজিক প্রগতির কর্তব্য সাফল্যের সঙ্গে পালিত হতে থাকে যখন প্রগতিশীল ক্ষমতা নির্ভর করে জনগণের ওপর, তাদের সমবেত করে সংগ্রামে, যখন প্রতিক্রিয়ার দুরভিসন্ধির প্রতিরোধে দাঁড়ায় সমস্ত শক্তির ঐক্য।

ঔপনিবেশিক আমল বিলুপ্ত করার পর জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাধারণ মঞ্চের কাজ করে বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কর্মসূচি। এই কর্মসূচি ঘিরে ঐক্যবদ্ধ হয় শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক, গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী, শহুরে পেটি বুর্জোয়া, ফৌজের দেশ-প্রেমিক মহল, জাতীয় বুর্জোয়ার নির্দিষ্ট একটা অংশ।

এক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীই হল বৈপ্লবিক পুনর্গঠন কার্যকৃত করার পক্ষে সবচেয়ে সঙ্গতিপরায়ণ যোদ্ধা। এই ধরনের বহু দেশে প্রলেতারিয়েত তার বিকাশের বাল্যকালেই কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেছে। জনগণের মৌল স্বার্থ সর্বাধিক পূর্ণাকারে প্রকাশ করে কমিউনিস্টরা।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যে রূপে, যে পথেই মুক্তি সংগ্রাম চলুক, তার সফল বিকাশের অতি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী একক জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠন যাতে সংগ্রামে যোগ দিতে, বিপ্লবের নির্দিষ্ট পর্যায়ে প্রগতিশীল ভূমিকা নিতে যারা সক্ষম,

জাতির তেমন সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি মিলিত হয়।

যুক্তফ্রন্ট গঠনে শ্রেণী সংগ্রাম বন্ধ হয় না। সাধারণ জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণী তাদের নিজস্ব বিশিষ্ট স্বার্থও রক্ষা করে। সাম্রাজ্যবাদ আর তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সংঘাতটা প্রধান বিরোধ হলেও সেইসঙ্গে অভ্যন্তরীণ সামাজিক বিরোধ ক্রমেই তীব্র হয়ে ওঠে। এটাই হল বর্তমান পর্যায়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শ্রেণী সম্পর্ক বিকাশের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যসূচক দিক।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি, বিশেষ করে বৈপ্লবিক গণতন্ত্রী আর কমিউনিস্টদের নিবিড় ঐক্য, শ্রমিক শ্রেণী, মেহনতী জনগণের সক্রিয়তা, সংগঠনশীলতা বৃদ্ধি বর্তমান পর্যায়ে ক্রমেই বেশি করে গুরুত্ব অর্জন করছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তিদের সংগ্রামে নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে এইসব দেশের ভাগ্য।

সপ্তম অধ্যায়

ইতিহাসের বর্তমান পর্যায়ে শ্রেণী সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য

বর্তমান যুগের মূলগত মর্মার্থ হল পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ। মূর্ত-নির্দিষ্ট যে কর্তব্যই তা গ্রহণ করুক, এটা প্রকাশ পাচ্ছে প্রতিটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের সমস্ত বৈচিত্র্যেই।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব ছিল শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সামাজিক বিপ্লব শৃংখলের প্রথম আংটা। তা দেখা দেয় বিশ শতকের গোড়ায় সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব ব্যবস্থার বিরোধ বিকাশের নিয়মানুগ পরিণাম হিশেবে। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব আর প্রাণশক্তি বিদীর্ণ হল। শুরু হল পুঁজিতন্ত্রের প্রগাঢ় সাধারণ সংকটের পর্ব, যা ব্যাপ্ত হল অর্থনীতি, রাজনীতি, ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে।

অক্টোবর বিপ্লব বিশ্ব বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের

বিজয়ী অভিজ্ঞতা, বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের অভিজ্ঞতা দিয়ে। শ্রমিক আন্দোলনকে অক্টোবর তুলে দিল উচ্চতর ধাপে। তার প্রভাবে অধিকাংশ পুঁজিতান্ত্রিক দেশে দেখা দিল লেনিনীয় ধরনের পার্টি। এ বিজয়ের আরেকটা ফলও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয় — সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় সংকটের সূত্রপাত। ঔপনিবেশিক জনগণের জাতীয় আত্মচেতনার বৃদ্ধিতে একটা প্রচণ্ড ঠেলা দেয় রাশিয়ার বিপ্লব।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের বিজয় এবং বিশ্ব মঞ্চে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবে গড়ে উঠল শ্রেণী সংগ্রামের নতুন ফ্রন্ট: দুটি সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্ব। এই শ্রেণী সংগ্রামটা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে সশস্ত্র প্রতিহত করা থেকে রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আর পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা পর্যন্ত বিভিন্ন রূপ নিতে পারে।

১। উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে বর্তমান শ্রেণী সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য

বর্তমান কালের একটি বৈপ্লবিক শক্তি হল উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক শ্রেণী। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ এখানে ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠে ব্যাপক শ্রেণী চরিত্র গ্রহণ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর তার নাটো পার্টনারদের আগ্রাসী পলিসির ফলে আন্তর্জাতিক উত্তেজনার তীব্রতা বৃদ্ধির, তারা যে বলগাহীন অস্ত্র প্রতিযোগিতা চাপিয়ে দিচ্ছে, তার সর্বনাশা প্রভাব

পড়ছে কোটি কোটি মেহনতি আর তাদের সংসারের ওপর। চিরাচরিত পর্যায়ক্রমিক সংকটের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে অর্থনীতির প্রগাঢ় গাঠনিক সংকট, তার ফলে অর্থনীতির বহু শাখার মেহনতিরা পড়েছে দুঃসহ অবস্থায়। মেহনতিদের দুর্দশা বিশেষ করে বেড়েছে ব্যাপক বেকারি বৃদ্ধিতে। ৮০'র দশকে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে কর্মহীনের সংখ্যা ৩ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

একই সঙ্গে দ্রুতবেগে বাড়ছে মুদ্রাস্ফীতি এবং কর, সামাজিক প্রয়োজনে অর্থ বরাদ্দ কমছে। বাড়ছে খাদ্য দ্রব্য ও শিল্পপণ্যের দাম। এ সবের ফলে মেহনতিদের জীবনযাত্রার মান বেশ নেমে যায়। তাছাড়া সবদিক দিয়ে শ্রমজীবীদের অধিকারে হামলা করছে পুঁজি, বিপন্ন হয়ে পড়ছে সুদীর্ঘ একরোখা সংগ্রামে অর্জিত বিজয়গুলি (শ্রম রক্ষার প্রাথমিক মান, উদ্যোগে ট্রেড-ইউনিয়ন থাকার অধিকার, ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হবার অধিকার ইত্যাদি)।

একচেটিয়ার আধিপত্যে মেহনতিদের অসন্তোষ এবং উন্নত জীবনের অধিকার রক্ষায় তাদের দৃঢ় সংকল্পের একটা সূচক হল ধর্মঘট সংগ্রামের বিস্তার।

৭০-৮০'র দশকে প্রধান প্রধান পুঁজিতান্ত্রিক দেশে ধর্মঘট আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ধর্মঘটীদের সামাজিক অবস্থানের প্রসার, নতুন নতুন স্তরের মেহনতিদের যোগদান। ধর্মঘট সংগ্রামে ব্যাপকভাবে অংশ নিচ্ছে সেবা ব্যবস্থার কর্মীরা। শিক্ষক ধর্মঘটের সংখ্যা প্রচুর বেড়েছে।

ফ্রান্সে ইদানীং ধর্মঘট সংগ্রামে এসে যাচ্ছে 'শাদা কলারের' লোকেরা: সরকারি কর্মচারী, ডাক-তার, ব্যাঙ্ক, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিল্পকর্মী। এ সংগ্রামে যোগ দিচ্ছে পরিবহণ, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, এমনকি পুলিস বাহিনীর লোকেরাও। সুইডেন, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, ডেনমার্ক প্রভৃতি যেসব দেশ আগে ছিল অপেক্ষাকৃত শান্তি, সেখানেও ধর্মঘটীর সংখ্যা বাড়ছে।

৮০'র দশকের গোড়ায় একসারি বহুজাতীয় কর্পোরেশনের উদ্যোগগুলিতেও ধর্মঘট চলে। এই ধরনের একচেটিয়া জোটগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বর্তমানে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, তা পালনের ওপর নির্ভর করে ব্যাপক একচেটিয়াবিরোধী ফ্রন্ট গঠন, সাহায্য হয় মেহনতিদের আন্তর্জাতিক একাত্মতা বৃদ্ধিতে।

সাধারণ জাতীয় সংঘাতের ক্ষেত্রে শ্রেণী সংগ্রামের কেন্দ্র সরে আসাটা বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য। একচেটিয়া পুঁজির রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়ায় পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে চলছে ব্যাপক জনগণের স্বার্থের ওপর বৃহৎ একচেটিয়ার আক্রমণ। মজুরি খাটা মেহনতিদের শোষণ বেড়ে উঠেছে, আরো ধ্বংস পাচ্ছে কৃষক আর শহুরে খুদে মালিকরা। ছোটো আর মাঝারি শহুরে বুর্জোয়া ক্রমেই বেশি করে মুশকিলে পড়ছে। বৃহৎ একচেটিয়ার পীড়ন জাতির সমস্ত স্তরের পক্ষেই হয়ে উঠছে ক্রমাগত দুঃসহ। এইভাবে বুর্জোয়া সমাজে শ্রম আর পুঁজির মধ্যে মূলগত বিরোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুগভীর হয়ে

উঠছে একচেটিয়া আর জাতির অধিকাংশের মধ্যে বিরোধ।

শ্রেণী শক্তিগুলির নতুন বিন্যাসে জনগণের ব্যাপকতম স্তরগুলির সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর জোট স্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। শান্তি, নতুন বিশ্ব যুদ্ধ নিবারণের জন্য সংগ্রাম, নিরস্ত্রীকরণের জন্য সংগ্রাম জাতীয় সার্বভৌমত্বের জন্য সংগ্রাম — এ হল এমন সাধারণ গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম যাতে ব্যাপকতম জনগণ আগ্রহী। সমস্ত মেহনতির কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে এগুলি ঠেকে যাচ্ছে একচেটিয়া পুঁজির সর্বশক্তিমত্তায়। ঘটছে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের আঙ্গিক মিলন। একচেটিয়ার ক্ষমতার সবচেয়ে প্রবল প্রতিপক্ষ আর সমস্ত একচেটিয়াবিরোধী শক্তির আকর্ষণ বিন্দু হল শ্রমিক শ্রেণী।

শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকার, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের বিরোধিতায় আধুনিক বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা এই কথা বলে যে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকেরা বুর্জোয়া হয়ে উঠছে, তাদের শ্রেণী চেতনা লোপ পাচ্ছে, অঙ্গীভূত হচ্ছে বা গেঁথে যাচ্ছে বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে। উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রলেতারীয় বৈপ্লবিকতার এই তথাকথিত অন্তর্ধানের কারণ তারা দর্শায় প্রলেতারিয়েতের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিতে।

সত্যিই এসব দেশের শ্রমিকেরা তাদের পিতা-পিতামহদের চেয়ে ভালোভাবে দিন কাটায়। উন্নত

হয়েছে শ্রমিকদের বেতন আর শ্রমের পরিস্থিতি, বেড়ে উঠেছে পারিবারিক উপার্জনের মান এবং ব্যক্তিগত চাহিদা; শিক্ষা, সংস্কৃতির মান এখন উঁচু, স্বাস্থ্য রক্ষা এখন কিছুটা সাধ্যায়ত্ত, সামাজিক ভরণপোষণের ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে, পাওয়া যাচ্ছে সবেতন ছুটি। শ্রমিকদের নাগরিক ও ট্রেড-ইউনিয়ন অধিকার প্রসারিত হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ এইসব সামাজিক-অর্থনৈতিক দাবি উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকেরা আদায় করেছে একরোখা সংগ্রামে। মার্কস লিখেছেন, 'সামাজিক সংস্কার কার্যকৃত হয়েছে কখনোই শক্তিশালীদের দুর্বলতার দরুন নয়, সর্বদাই দুর্বলদের শক্তির কল্যাণে।'*

উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় যে পরিবর্তন চলেছে বর্তমান বৈজ্ঞানিক টেকনিকাল বিপ্লবের বিকাশ তার কেন্দ্রে রাখছে মেহনতী মানুষকে। উন্নত দেশগুলির সাম্প্রতিক শ্রমিক কয়েক দশক আগের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত। বৃত্তিগত প্রস্তুতি তার অনেক উঁচু, জটিলতর কাজ চালাতে সে সক্ষম। বহু উৎপাদনী প্রক্রিয়ার মূলকথাটা সে বোঝে, স্বাধীন সৃজনমূলক কাজে সক্ষম। ধর্মঘট সংগ্রামের গতিপথে যেসব কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে শ্রমিকেরা তা দখলে নেয়, সেখানে তারা দেখিয়েছে যে শ্রমিক যৌথ উৎপাদন চালাতে

---

* Karl Marx and Frederick Engels, *Collected Works*, Vol. 6, p. 288.

পারে। শ্রমিক শ্রেণীর এই নতুন বিকাশ পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিচ্ছে ব্যক্তির আত্মিক বিকাশের নতুন চাহিদা, বড়ো বড়ো সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনে অংশগ্রহণের দাবি। কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের পরিস্থিতিতে এসব দাবি পূরণের সুযোগ শ্রমিকদের নেই। তাই দেখা দেয় বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের নতুন প্রেরণা।

চাহিদার এই নতুন মানের চেতনা দৈনন্দিন শ্রেণী সংগ্রামকে তুলে দেয় পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের গোটা ব্যবস্থার আমূল বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামের উচ্চতর স্তরে। শ্রমিকেরা দাবি করে উৎপাদনের পরিচালনায় অংশগ্রহণ, তাদের সামাজিক অধিকারের সম্প্রসারণ, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, সমাজজীবনের সর্বদিকের গণতন্ত্রীকরণ। এই ধরনের দাবি শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক সম্ভাবনা 'ফুরিয়ে আসার' সাক্ষ্য নয়, বরং তাতে বোঝায় যে শ্রমিক আন্দোলন উচ্চতর পর্যায়ে প্রবেশ করছে, একচেটিয়া পুঁজির গোটা প্রভুত্বের বিরুদ্ধে, সমগ্রভাবে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে তা চালিত হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের অবস্থায় প্রলেতারিয়েতের অর্থনৈতিক সংগ্রামে পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের বিরোধিতা হিশেবে, শ্রমিক শ্রেণীর সক্রিয়তা বিকাশ হিশেবে তার তাৎপর্য অক্ষুণ্ণ থাকে। চিরাচরিত বহু অর্থনৈতিক দাবিও তাতে ভরে উঠছে নতুন মর্মার্থে। ক্রয়শক্তি রক্ষা, পারিশ্রমিক বৃদ্ধি, নিখিল জাতীয় চরিত্রের মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী ব্যবস্থার মতো দাবি,

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক সংকটের বোঝা মেহনতিদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে চালিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্মসংস্থানের গ্যারান্টির দাবি ক্রমেই চলে আসছে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পলিসি নির্ধারণে মেহনতি ও তাদের সংগঠনাদির অংশ গ্রহণের দাবিতে।

কিন্তু বর্ধমান অস্ত্র প্রতিযোগিতার পরিস্থিতিতে মেহনতিদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি কি সম্ভব? সেইজন্য মেহনতিরা তাদের মৌলিক দাবির অন্তর্গত করেছে নতুন যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, মানুষের জীবনযাত্রা ও শ্রমের পরিস্থিতি রক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তিযুক্ত সদ্ব্যবহারের দাবি।

বাস্তব জীবনই শ্রমিক শ্রেণীকে অর্থনৈতিক সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশলকে আক্রমণমুখী করে তুলতে বলছে। অর্থনীতির রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের বিপরীতে পশ্চিমের বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের নিজস্ব গণতান্ত্রিক কর্মসূচি পেশ করছে।

এইসব কর্মসূচি প্রধানত তিনটি জিনিস নিয়ে: গণতান্ত্রিক জাতীয়করণ, উদ্যোগাদির পরিচালনায় ও তাদের ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রণে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ এবং গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চলে রাজনৈতিক সংগ্রামের তীব্রায়ণ।

অধিকাংশ পুঁজিতান্ত্রিক দেশে শাসক মহলগুলির পলিসির বিরোধিতা বেড়ে উঠছে প্রচণ্ড। শ্রমিক

নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদন পরিচালনায় তাদের অংশগ্রহণের ধ্বনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী কর্মসূচিতে। শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের জন্য সংগ্রাম হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যাপক যুব ও ছাত্র আন্দোলনের অনুঘটক। সংবাদ মাধ্যম, খবরের কাগজ, রেডিও, টিভির ওপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ধ্বনি ক্রমেই সমর্থন লাভ করছে। একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য ব্যবস্থা এবং তার রাজনৈতিক প্রভুত্বের সরাসরি বিরোধিতা করছে মেহনতিদের দাবি।

বর্তমান সমাজের প্রধান উৎপাদক ও সামাজিক শক্তি হিশেবে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা যতই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে, ততই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভাবাদর্শীয় সংগ্রাম, শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক তত্ত্বের বিকাশ। এক-চেটিয়া পুঁজি শ্রমিকদের চেতনায় সঞ্চার করতে চায় মেহনতি আর উদ্যোক্তাদের মধ্যে সম্পর্কের একটা মিথ্যে ধারণা। বুর্জোয়া ভাবাদর্শের কাজ হল বুর্জোয়া আর শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থের মিল দেখানো, যেন শ্রেণী সংগ্রাম বলে কিছু নেই। 'জাতীয় আয়ের পিঠেটা যত বড়ো হবে, ততই বেশি তা পড়বে শ্রমিক শ্রেণীর ভাগে' — অর্থনৈতিক সংকটের বর্তমান পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া প্রচার পুনরায় এই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটছে। সেইসঙ্গে সংকটজনিত বোঝাটা বিজনেস, কারবার আর শ্রমিকদের মধ্যে 'সমান ভাগা-ভাগি' করে নেবার মন্ত্রণাও বাদ থাকছে না। 'সামাজিক শান্তির' ডাক দেবার পেছনে আছে এই মিথ্যা কথাটা। শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের দাবির বিপরীতে বিজনেসকে দাঁড়

করিয়ে 'শিল্প গণতন্ত্রের' কর্মসূচিও একই লক্ষ্য অনুসরণ করে। উদ্যোগাদির পরিচালনায় মেহনতী সংগঠনগুলির তেমন অংশগ্রহণের কথা তাতে থাকে যাতে শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রামে নিরস্ত হয়।

শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর ভাবাদর্শীয় সংগ্রাম একটা বিশেষ তীব্রতা লাভ করে। মজুরি-খাটা মেহনতিদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও গাঠনিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খোদ শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যন্তরে পার্থক্য বাড়তে থাকে। শ্রমিক শ্রেণীর বিভিন্ন বাহিনীর অভিজ্ঞতা একরকম নয়, সচেতনতায়, সংগঠনশীলতা আর সাধারণ আন্দোলনে যোগদানের দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে।

উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে অনেক বিদেশী শ্রমিক কাজ করে, প্রলেতারিয়েতের সাধারণ শ্রেণী সংগ্রামে তাদের টেনে আনা শ্রমিকদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। সংখ্যার দিক দিয়ে এরা শ্রমের একটা বড়ো বাহিনী, পুঁজি কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে শোষিত। সবচেয়ে কষ্টকর কাজগুলো করে বিদেশী শ্রমিকেরাই।

যেমন, ফ্রান্সে বিদেশী শ্রমিকদের মূল্যাংশ উৎপাদনের প্রধান শাখাগুলির বড়ো বড়ো উদ্যোগে কেন্দ্রীভূত। 'রেনো' মোটরগাড়ি কারখানায় কনভেয়ার বেল্টে যারা কাজ করে, তাদের পাঁচ জনের মধ্যে চারজনই বিদেশী। বহু বিদেশী খাটে ইস্পাৎ গালাই শিল্পে, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদিতে। এই জন্যই শ্রেণী সংগ্রামে ফরাসি মেহনতিদের সঙ্গে বিদেশী শ্রমিকদের যোগদানে কমিউনিস্ট পার্টি ও সাধারণ শ্রম ফেডারেশন এত জোর

দেয়। কর্ম সংস্থান ও বৃত্তিগত শিক্ষালাভের দিক থেকে ফরাসিদের সঙ্গে বিদেশী শ্রমিকদের সমান সুযোগের জন্য চেষ্টা করে তারা।

একচেটিয়া পুঁজি মেহনতিদের এই বুঝ দিতে চায় যে বিদেশী শ্রমিকেরাই নাকি বেকারি বৃদ্ধির জন্য দায়ী, এই করে তারা শ্রমিক আন্দোলনে ভাঙন ঘটাতে চায়। তাই সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল: পশ্চিম ইওরোপীয় দেশগুলির মেহনতি আর বিদেশী শ্রমিকদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক ও ভাবাদর্শীয় বেড়া অতিক্রম, সাধারণ একচেটিয়াবিরোধী লক্ষ্যে কর্মের সত্যকার ঐক্য অর্জন করা। এই ঐক্যের ফলে গড়ে ওঠে কৃষক, অগ্রণী বুদ্ধিজীবীদের জনবহুল স্তর, তথা নতুন 'মধ্য স্তরদের' নিয়ে ব্যাপকতর বৈপ্লবিক জোট গঠনের ভিত্তি।

নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে প্রলেতারিয়েতের সহযোগী হতে পারে শ্রেণীচ্যুত স্তরেরাও, পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট তীব্র হয়ে ওঠার ফলে তাদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে তাদের আচরণের বৈশিষ্ট্য হল চূড়ান্ত রকমের অস্থিরতা, নড়বড়ে অবস্থান, ক্রিয়াকর্মের ইতিবাচক দিকটায় তাচ্ছিল্য।

একচেটিয়াবিরোধী কোআলিশনের ভিত্তি সম্প্রসারণের ফলে গড়ে ওঠে একচেটিয়া পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে পরিণত হবার পরিস্থিতি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আমূল গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কর্মসূচি পেশ করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিরা। এরূপ

কর্মসূচিতে মেহনতিদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক বিকাশকে সরাসরি প্রভাবিত করার সম্ভাবনা খুলে যাওয়া উচিত। রাষ্ট্র ক্ষমতার বৈপ্লবিক পুনর্গঠনে আবার বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য উচ্ছেদ এবং সত্যকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তা কাজে লাগানো সম্ভব হয়।

সত্যকার গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের কর্মসূচিতে বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলনের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য অনুদিত হয় মূর্তনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের ভাষায়। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা ও জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগের ওপর নির্ভর করে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে এ কর্মসূচি বাস্তবে রূপায়িত করা এবং তাতে করে মানবজাতির সামাজিক অগ্রগতিতে নির্ধারক অবদান যোগ করা পুরোপুরি সম্ভব।

২। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শ্রেণী সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য

সমাজতন্ত্র আর পুঁজিতন্ত্র — এই দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামে প্রকাশ পাচ্ছে বর্তমান যুগের মূলগত বিরোধ। এই বিরোধের প্রভাবাধীনে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উৎসারিত হতে থাকে শ্রেণী সংগ্রাম। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রথম পর্যায়, রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম এখন সমাপ্ত। বর্তমান পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পরস্পর

সম্পর্কিত দুটি কাজ: অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম এবং স্বাবলম্বী সামাজিক বিকাশের সর্বাধিক ফলপ্রদ পথের সন্ধান।

পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি চেষ্টা করে যাতে সদ্যোমুক্ত দেশেরা পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের আওতা থেকে বেরিয়ে না যায়, অর্থনৈতিক পরাধীনতার নতুন বাঁধনে বাঁধতে চায় তাদের। সেইসঙ্গে বিশ্ব পুঁজিতন্ত্র তাদের ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলিকে দেখে সমাজতন্ত্রের বর্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামের ব্যূহমুখ হিশেবে, চেষ্টা করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শ্রেণী শক্তির অনুপাত প্রভাবিত করতে। বিকাশের পথ নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে তীব্র হয়ে ওঠে সামাজিক-রাজনৈতিক সংগ্রাম।

উন্নয়নশীল দেশে শ্রেণী সংগ্রাম জড়িয়ে যায় জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সঙ্গে। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুক্তফ্রন্টে যোগ দিয়েছিল কার্যত সমাজের প্রায় সমস্ত স্তরই। এতে জাতীয় ঐক্য, এসব দেশের অধিবাসীদের শ্রেণীগত একাত্মতার বিভ্রম সৃষ্টিতে সাহায্য হয়। এইরকমের ধারণা সবচেয়ে বেশি প্রচলিত আফ্রিকান দেশগুলিতে (বিশেষ করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আফ্রিকায়) যেখানে শ্রেণীর রূপলাভ এখনো সম্পূর্ণ হয় নি, পিতৃতান্ত্রিক, গোষ্ঠীসমাজসুলভ সম্পর্ক অসাধারণ প্রবল।

'আফ্রিকান সমাজতন্ত্রের' কিছু তত্ত্বকার আফ্রিকায় চিরাচরিত গোষ্ঠীসমাজসুলভ সম্পর্কের দুর্মরতায়

বিশেষ জোর দেন। তাঁরা ধরে নেন যে শ্রেণী সংগ্রাম ছাড়াই সামাজিক বিরোধের সমাধান হতে পারে এখানে। তাঁরা মনে করেন যে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের পর্বে উৎপাদনের সামাজিক সংগঠনের প্রধান কোষকেন্দ্র হতে পারে পুনর্জাত বৃহৎ পরিবার, যা একই সঙ্গে হবে জনগণের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লালনের বিদ্যালয়।

জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের সামাজিক সারার্থ যত গভীর হয়, অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে ততই প্রধান হয়ে সামনে আসে আমূল সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রাম, ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে জাতির মধ্যে স্তরভেদ, দ্রুত রূপ নিতে থাকে শ্রেণী বিভাগ। পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে সদ্যোমুক্ত দেশে শ্রেণী বিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ার ভরসাটা বিভ্রান্তি। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রগতিশীল প্রতিনিধিরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে শ্রেণী সংগ্রামই হল মৌল সমস্যা, তা বাদ দিলে বিকাশের পথ নিয়ে কোনো কথাই হতে পারে না।

আফ্রিকার দেশগুলি সমেত সমস্ত উন্নয়নশীল দেশই বিকশিত হচ্ছে বিশ্ব ইতিহাসের মৌল নিয়মাদি অনুসারে, শ্রেণী সংগ্রাম বিকাশের পর্যায় তারা এড়াতে পারে না।

সদ্যোমুক্ত দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকা কী, আমূল সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রামে তাদের পক্ষে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে কী সম্ভব, এই প্রশ্ন বর্তমানে ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তার উত্তর দিতে হলে প্রয়োজন পরিপক্কতা, সংগঠনশীলতার পর্যায়সূচক মূর্ত-নির্দিষ্ট ব্যাপার-

গুলির হিসেব নেওয়া, এক-একটা অঞ্চল ও পৃথক পৃথক দেশের শ্রমিকদের শ্রেণী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বিচার করা।

ভারত এবং লাতিন আমেরিকার বহু দেশের মতো শিল্প বিকাশের ইতিহাস যেখানে অপেক্ষাকৃত সুদীর্ঘ, সেখানকার প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বেশ সমৃদ্ধ। শ্রমিক আন্দোলনে নিজেদের বিশিষ্ট অবদান যোগ করছে আফ্রিকান দেশগুলির নবীন প্রলেতারিয়েত।

এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে ক্রমেই শ্রমিক আন্দোলনের কতকগুলি সাধারণ চরিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠছে: অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী চেতনা ও সক্রিয়তার মান বাড়ছে, দেখা দিচ্ছে অন্যান্য সামাজিক স্তর — কর্মচারী, ছাত্র, পেটি বুর্জোয়া বিশেষ করে মেহনতিদের সর্বাধিক জনবহুল শক্তি হিশেবে কৃষকদের সঙ্গে নতুন যুক্ত ফ্রন্ট। ক্রমেই সংগঠিত চরিত্র ধারণ করছে শ্রমিক আন্দোলন, ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠনগুলির জাল এবং তাদের ক্রিয়াকলাপের ফ্রন্ট প্রসারিত হচ্ছে, দেখা দিচ্ছে ও সংহত হচ্ছে অগ্রণী শ্রমিক-কৃষক পার্টি, স্থাপিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক চরিত্রের যোগাযোগ।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রলেতারিয়েতের বর্তমান অর্থনৈতিক সংগ্রামের রূপ নানা রকমের। যেমন ধর্মঘট, বেতন বৃদ্ধির দাবিতে মিছিল, অনশন ধর্মঘট, মেহনতিদের বৈষয়িক অবস্থা উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট আবেদন পত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ, বয়কট, শ্রমিকগণ

কর্তৃক উদ্যোগ দখল ইত্যাদি। এসব দেশে শ্রমিক আন্দোলন একসারি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। প্রাচ্য ও লাতিন আমেরিকার প্রায় সমস্ত দেশেই সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন মেহনতিদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ের নিদর্শন। মেহনতিদের অভিযানের চাপে আফ্রিকার একসারি দেশে গৃহীত হয়েছে শ্রম আইন।

নিজেদের স্বার্থ রক্ষার সংগ্রামে ক্রমেই গুরুত্ব অর্জন করছে **ধর্মঘট আন্দোলন,** ইদানীং তা ব্যাপ্ত হয়েছে নতুন নতুন অঞ্চল ও দেশে। আফ্রিকার যেসব দেশ পুঁজিতান্ত্রিক পথে চলেছে, সেখানে প্রসারিত হচ্ছে ধর্মঘট আন্দোলন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শ্রমের, অবাধে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার, ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার ধর্মঘট চালানোর অধিকার আইনত স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ধর্মঘটের অধিকার হয়ে দাঁড়াচ্ছে একটা বাহ্যিক ঠাট, প্রায়ই সেটাকে অভিহিত করা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার লঙ্ঘন বলে। ধর্মঘটকে অসিদ্ধ ঘোষণার অধিকার থাকছে সরকারের হাতে। একাধিক আফ্রিকান দেশে ইদানীং 'বন্য', অর্থাৎ সংস্কারবাদী ট্রেড-ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অনুমোদন পায় নি এমন ধর্মঘটের সংখ্যাবৃদ্ধি লক্ষিত হচ্ছে।

ধর্মঘটী শ্রমিকেরা প্রধান যে দাবি পেশ করে তা হল মজুরি বৃদ্ধি, শ্রমের পরিস্থিতি উন্নয়ন। প্রায়ই ধর্মঘটের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে মালিকদের পক্ষ থেকে মেহনতিদের ট্রেড-ইউনিয়ন অধিকার ও স্বাধীনতা লঙ্ঘন (প্রশাসনের ট্রেড-ইউনিয়ন বিরোধী ক্রিয়াকলাপ,

শ্রম চুক্তি লংঘন ইত্যাদি)। ধর্মঘটের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে উৎপাদনী গণতন্ত্র রক্ষা ও বিকাশ।

শ্রমিক শ্রেণীর অভিযান ক্রমেই **ঘন ঘন দেশব্যাপী রাজনৈতিক ধর্মঘটে** পরিণত হচ্ছে, প্রলেতারিয়েত তখন কেবল নিজের আশু অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্যই নয়, নিখিল জাতীয় লক্ষ্যের জন্য, মেহনতিদের অন্যান্য স্তর -- কর্মচারী, কারুজীবী, বিশেষ করে কৃষকদের নিয়ে গণতান্ত্রিক চরিত্রের দাবির জন্য সংগ্রাম করে। যেমন ১৯৮২ সালের জানুয়ারিতে ভারতে সাফল্যের সঙ্গে পালিত হয় একদিনের সাধারণ ধর্মঘট। তার দাবিগুলির সঙ্গে যোগ করা হয়েছিল ক্ষেত মজুরদের জন্য ন্যূনতম মজুরির গ্যারাণ্টি, খামারিদের ন্যায্য পারিশ্রমিক স্বরূপ ফসলের দর নির্ধারণের দাবি সমর্থন, এবং একসারি সাধারণ গণতান্ত্রিক দাবি। প্রশনগুলির এইরূপ উপস্থাপনে দেশের অনেক অঞ্চলে জনগণকে একত্রে সমাবিষ্ট করা সম্ভব হয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলনের একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রলেতারিয়েতের সর্বাধিক শোষিত অংশকে -- **ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের আন্দোলনে** টানা। এদিক থেকে বিশেষ সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে লাতিন আমেরিকান শ্রমিক শ্রেণী। গ্রামাঞ্চলে কৃষি সংস্কারের জন্য সংগ্রাম বিকশিত হচ্ছে যেমন ধর্মঘট, প্রতিবাদ, সংগঠিত পদযাত্রা, মিটিং, মিছিল মারফত, তেমনি জমিদারি জমি দখল করে কৃষকদের মধ্যে তা বণ্টনের মধ্যে দিয়েও। গড়া হচ্ছে কৃষি সংস্কার সাধনের জন্য কৃষক কমিশন

ও কমিটি। অধিকাংশ কৃষক সংগঠন যে ট্রেড-ইউনিয়ন কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, সেটাও সংগ্রামের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়ার অনেক দেশেও জমিদারি ভূমিস্বত্ব উচ্ছেদের জন্য, ট্যাক্স হ্রাসের জন্য সংগ্রামে শ্রমিকদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করছে কৃষকেরা।

উন্নয়নশীল দেশে ধর্মঘট সংগ্রামে শিল্প ও কৃষির প্রলেতারিয়েতরা ছাড়াও ক্রমেই ঘন ঘন যোগ দিচ্ছে **সরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগাদি** এবং প্রতিষ্ঠানের **কর্মচারীরাও।** প্রচণ্ড বেড়ে উঠেছে, শিক্ষক, ডাক্তার, হাসপাতালের সেবাকর্মী, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার-টেকনিসিয়ানদের আন্দোলন। শ্রমিকদের মতো তারাও ট্রেড-ইউনিয়ন গড়া, ধর্মঘট ঘোষণা করার অধিকার লাভের জন্য চেষ্টা করছে, মালিক ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে দমননীতির প্রতিবাদ করছে।

তবে, এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় ধর্মঘট আন্দোলন অবিরাম ঊর্ধ্বমুখী, একথা ভাবলে ভুল হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলির অভ্যন্তরে বিভিন্ন বুর্জোয়া পার্টি ও সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক সংস্কারবাদী সংস্থাগুলির প্রভাবে শ্রমিক আন্দোলনের সাধারণ মান মাঝে মাঝে সাময়িকভাবে নেমে যায়। নানা রকমের মিথ্যা বাগাড়ম্বরী আশ্বাস দিয়ে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ দাবি পূরণের সংগ্রাম থেকে দোলায়মান শ্রমিকদের সরিয়ে আনা কখনো কখনো সম্ভব হয় ওদের পক্ষে।

শ্রমিক আন্দোলনের প্রসার, তার গভীরতা, সংগঠনশীলতা বৃদ্ধিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

নেয় ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন। তার কারণ কেবল শ্রমিক আন্দোলনের সম্মুখস্থ কর্তব্যের প্রকৃতি ও পরিসরই নয়, এটাও তার একটা কারণ যে কিছু দিন আগে পর্যন্ত বহু দেশে (বিশেষ করে আফ্রিকায়) শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি কার্যত প্রায় ছিল না, ট্রেড ইউনিয়নই এগিয়ে এসেছিল তাদের একমাত্র শ্রেণী সংগঠন হিশেবে। গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রামে এসব দেশের ট্রেড ইউনিয়ন প্রায়ই হয়ে দাঁড়িয়েছিল মেহনতি জনগণের সক্রিয় সংগঠক। বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ট্রেড-ইউনিয়ন সদস্যের সংখ্যা ৬ কোটি ৩০ লক্ষ, মজুরি খাটা কর্মীদের মোটামুটি ২০ শতাংশ।

লাতিন আমেরিকায় ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন বেশি বিকশিত। সেখানকার জনগণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে দেড় শতাধিক বছর আগে, শ্রেণী সংগ্রামের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা আছে তাদের। আফ্রিকায় ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করেছে, হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা প্রভাবশালী সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি। সেটা প্রকাশ পেয়েছে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনে ভাঙন দূর করে অধিকাংশ আফ্রিকান দেশে একটি ট্রেড-ইউনিয়ন কেন্দ্র গড়ায়, একটি সাধারণ আফ্রিকান কেন্দ্র — আফ্রিকান ট্রেড-ইউনিয়ন ঐক্যের সংগঠন স্থাপনে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চরিত্রের বড়ো বড়ো একসারি ধর্মঘট চালনায়, নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর সফল সংগ্রামে।

সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়ন জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পন ও সংগঠনে, উৎপাদন পরিচালনায় অংশ নেয়। অর্থনৈতিক উত্থান, মেহনতিদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক মান বৃদ্ধির জন্য সংগ্রামের ব্যাপারে ট্রেড ইউনিয়ন এবং শাসক বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কার্যত নিবিড় সহযোগিতা।

পুঁজিতন্ত্রমুখী দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণীর কাজ অন্যবিধ, কেননা উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনিবার্যই বৃদ্ধি পায় মেহনতিদের শোষণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটে। তাই এখানকার ট্রেড ইউনিয়ন শাসক মহলের সামাজিক-অর্থনৈতিক পলিসির সাধারণ ধারার পরিবর্তন এবং মেহনতিদের স্বার্থে প্রগতিশীল পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রাম বাড়িয়ে তোলে।

ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন যত বেড়ে ওঠে, তার সঙ্গে রাজনৈতিক পার্টির সম্পর্কও সেইসঙ্গে পালটে যায়। প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক পার্টি যে কেবল ট্রেড ইউনিয়নের সমর্থন পাবার চেষ্টা করে তাই নয়, প্রায়ই নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়নও গড়ে তোলে শ্রমিক ও কর্মচারীদের মধ্যে যার সাহায্যে নিজেদের রাজনীতি প্রচারের ভরসা করা যায়। এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে বিশেষ করে ভারতে, এখানে কার্যত সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি, এমনকি খোলাখুলি বুর্জোয়া পার্টিরও নিজস্ব ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠন আছে, যা এইসব পার্টির ভাবাদর্শ ও রাজনৈতিক পলিসি অনুসরণ করে। এর ফলে ট্রেড-

ইউনিয়ন ঐক্যে ভাঙন ধরে, মেহনতিদের অবস্থান দুর্বল হয়, বাধা ঘটে শ্রেণী চেতনার বিকাশে।

ট্রেড ইউনিয়নগুলি যেহেতু এখন এমন একটা প্রভাবশালী সামাজিক শক্তি যার হিসেব না নিয়ে চলে না, তাই বহু উন্নয়নশীল দেশের সরকার তাদের ক্রিয়াকলাপ নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রায়ই তারা হস্তক্ষেপ করে, তাদের পক্ষে অসুবিধাজনক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র ভেঙে দেয়, নিজেদের অনুগত নতুন ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ বিপন্ন হয়ে পড়ে, কেননা স্বাধীনতা না থাকায় নিজেদের প্রধান কাজ, মেহনতিদের স্বার্থ রক্ষায় তারা অক্ষম হয়।

বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতা এই যে ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠন যথেষ্ট প্রসারিত নয়, বিশেষ করে ছোটো ছোটো উদ্যোগ ও কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে, তাদের মধ্যে ঐক্যও নেই। ট্রেড-ইউনিয়ন ঐক্য বেশ কঠিন হয়ে পড়ে বর্ণগত, নরকৌলিক, ধর্মীয় কুসংস্কারের দরুন।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংগ্রামের যে অভিজ্ঞতা, তা থেকে দেখা যায় যে একদিকে ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভেতরকার বিভেদ বিদূরণ এবং অন্যদিকে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিদের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ হল এইসব দেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতের ভবিষ্যৎ সাফল্যের শর্ত ও

গ্যারান্টি। লেনিনের এই কথার গুরুত্ব আজো অক্ষুণ্ণ: 'শ্রমিক শ্রেণীর কাছে ঐক্য হল অশেষ মূল্যবান, অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ছত্রভঙ্গ শ্রমিকেরা কিছুই নয়, ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকেরাই সবকিছু।'*

বর্তমানে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের এমন আমূল পুনর্গঠন যাতে নয়া-ঔপনিবেশিক পীড়ন দূর হবে, তার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলির কর্মের ঐক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নয়া-ঔপনিবেশিকতার পাণ্ডা হল **বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি**। পশ্চিমের প্রায় শ'খানেক শিল্পদানব সত্যিকারের আক্রমণ চালাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতির ওপর। সেখান থেকে বছরে তারা নিঙড়ে নেয় ২০,০০০ কোটি ডলারের বেশি। ১৯৮০ সালে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে এইসব কর্পোরেশনের উদ্যোগে কাজ করত ৪০ লক্ষ লোক। কিন্তু উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক আর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শ্রমিকদের বেতনের মধ্যে পার্থক্য ভয়াবহ। যেমন বৈদ্যুতিক-টেকনিকাল শিল্পে সংযোজন-কর্মীদের ঘণ্টাপিছু মজুরি: মালয়েশিয়া আর দক্ষিণ কোরিয়ায় ৬০ সেন্টিম, তাইওয়ানে ১ ফ্রাঙ্ক, সিঙ্গাপুরে ৩·৭ ফ্রাঙ্ক, স্পেন, ইতালি, পশ্চিম জার্মানিতে ৩০-৪০ ফ্রাঙ্ক।**

---

* V. I. Lenin, 'Working-Class Unity', *Collected Works*, Vol. 19, Progress Publishers, Moscow, 1980, p. 519.

** *France Nouvelle* 19-25. 1.1980, p. 8.

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বহুজাতিক কর্পোরেশনের আক্রমণে সামাজিক বিরোধ, শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র হচ্ছে। যেমন অভ্যন্তরীণ, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রেণী শক্তিগুলি আরো বেশি করে বিপরীত প্রান্তে জড়ো হচ্ছে। শ্রমিকদের কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে এইসব কর্পোরেশনের সঙ্গে সফল সংগ্রাম চালানো যায় কেবল প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক ঐক্যের পরিস্থিতিতে। বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের মধ্যে, বিশেষ করে কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়ে তোলার জন্য এইসব কর্পোরেশনকে একচেটিয়াগুলি কাজে লাগায়।

শ্রমিক আন্দোলনকে বিভক্ত করার এইসব প্রয়াসের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়নগুলি গড়ে তোলে নতুন নতুন আন্তর্জাতিক সমন্বয় কমিটি, প্রয়োজন হলে যা বিভিন্ন দেশে নির্দিষ্ট কর্পোরেশনটির কর্মীদের সমবেত করতে পারবে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই ধরনের সমন্বয় কমিটি গড়া শুরু হয়েছে। এই ধরনের কমিটি কাজ চালাচ্ছে লাতিন আমেরিকায় 'জেনারেল মোটর্স'-এর কারখানাগুলিতে, আফ্রিকায় 'পেজো'-র শাখাদিতে।

বহুজাতিক কর্পোরেশনের মেহনতিদের আন্দোলন সমন্বয়ে জাতীয় ক্ষেত্রে মেহনতিদের সংগঠিত সংগ্রামের গুরুত্ব হ্রাস পায় না। ঐসব কর্পোরেশন শ্রমের কিছুটা উন্নত পরিস্থিতি ও উচ্চতর বেতনের ব্যবস্থা করে শ্রমিক শ্রেণীর জাতীয় বাহিনী থেকে নিজেদের শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা করে। শ্রমিক আন্দোলনকে বিভক্ত করে রাখার এ কৌশল স্পষ্টতই

প্রসারিত হবে। তাই নিজেদের অধিকারের জন্য সংগ্রামের উপায় হিশেবে শ্রমিক শ্রেণীর সামনে কর্তব্য দাঁড়াচ্ছে কর্মের ঐক্য। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যবস্থা ও প্রলেতারীয় একাত্মতা বর্তমানে একান্ত প্রয়োজন, কেননা শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে রয়েছে অসাধারণ সক্রিয় এক আন্তর্জাতিক প্রতিপক্ষ।

বিশ শতকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বৈপ্লবিক চরিত্রের বড়ো বড়ো কৃষক বিক্ষোভ দেখা গেছে। এসব দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে সেগুলি। এর ফলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কোনো কোনো ভাবাদর্শীর পক্ষে উন্নয়নশীল দেশে কৃষকদেরকেই প্রধান বৈপ্লবিক শক্তি বলে অভিহিত করার সুযোগ ঘটেছে। '...ঔপনিবেশিক দেশে কেবল কৃষক সম্প্রদায়ই বিপ্লবী' — ঘোষণা করেছেন আলজেরীয় বিপ্লবের ভাবাদর্শী ফ্রাঁস ফানন।*

বস্তুত উন্নয়নশীল দেশের অধিবাসীদের মধ্যে যারা অধিকাংশ সেই কৃষকেরা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সত্যিই সক্রিয় অংশ নিয়েছে। কিউবার বিপ্লবে গ্রামীণ মেহনতিরাই ছিল বৈপ্লবিক ফৌজের মূলাংশ। আলজেরিয়া এবং অন্যান্য দেশেও তাই ঘটেছে যেখানে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তির জন্য চলেছিল সশস্ত্র সংগ্রাম।

তবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে

---

* F. Fanon, Les damnés de la terre, Paris, 1961, p. 46.

কৃষকদের বৈপ্লবিকতার চরিত্র হয় বিভিন্ন। বিপ্লবের সামাজিক অন্তর্বস্তু যত গভীর হয়, ততই বেড়ে ওঠে তাদের শ্রেণীগত অসমধর্মিতা। সামাজিক পুনর্গঠনের কর্তব্যের ক্ষেত্রে কৃষকদের বিভিন্ন স্তর গ্রহণ করে বিভিন্ন অবস্থান। তাই সমস্ত মেহনতিদের স্বার্থে আমূল সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য সঙ্গতিশীল পরিচালকের ভূমিকা নেয় অসমধর্মী কৃষকেরা নয়, মেহনতি কৃষকদের সঙ্গে পাকাপোক্ত মৈত্রীতে আবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণী।

কৃষক আন্দোলনে সবচেয়ে বড়ো জোয়ার দেখা দিয়েছিল মুক্তি সংগ্রামের পর্বে, এ সংগ্রামের একটা অঙ্গ ছিল তারা।

এই পর্যায়ে কৃষকদের মধ্যে তখনো ভাঙন ধরে নি, আর যে অসহ্য পীড়নে সমস্ত কৃষকই সমান মাত্রায় পীড়িত হচ্ছিল, তা তাদের মিলন ও ঐক্যে সাহায্য করে। জমি পাওয়া এবং ঔপনিবেশিক, সামন্ততান্ত্রিক আর আধাসামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক — সব ধরনের শোষণ বিলোপের জন্য কৃষকেরা ছিল সরাসরি চেষ্টিত। সেই কারণে কৃষক আন্দোলন এ পর্বে মিলে যায় উপনিবেশমালিকদের বিরুদ্ধে সাধারণ জাতীয় আন্দোলনের একই স্রোতে।

জাতীয় স্বাধীনতা লাভের পর কৃষক আন্দোলনের প্রধান কথা হয়ে দাঁড়ায় কৃষির পুনর্গঠন। কৃষির পুনর্গঠন চলায় কৃষকদের শ্রেণীগত স্তরভেদ দ্রুত হয়। কৃষি সংস্কার থেকে কৃষকদের একাংশ লাভবান হয় এবং সক্রিয় সংগ্রাম থেকে সরে যায়। কৃষক আন্দোলনে দেখা দেয় নতুন দিক। নানা ধরনের

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া শোষণের বিরুদ্ধে, করের বোঝার বিরুদ্ধে ঘন ঘন দাঁড়াতে থাকে কৃষকেরা। কৃষকদের প্রলেতারীয় ও আধাপ্রলেতারীয় জনগণ সংগ্রাম চালায় ধনী চাষি এবং বুর্জোয়া হয়ে-ওঠা জমিদারদের পক্ষ থেকে শোষণ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে।

বর্তমান পর্বে সদ্যোমুক্ত পুঁজিতন্ত্রমুখী দেশগুলিতে কৃষক আন্দোলনের ধ্বনি অনেক প্রসারিত হয়েছে। ভূমির পুনর্বণ্টন, সুদখোরি ঋণ নাকচ, খাজনার শর্ত পরিবর্তন প্রভৃতি সামন্ততন্ত্রবিরোধী দাবির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই কৃষি উৎপাদনে পুঁজির ক্ষমতা সংকোচনের দাবি উঠছে। বিশেষত, দাবি করা হচ্ছে কৃষি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, সুলভ ঋণ, বেনিয়া পুঁজির একচেটিয়া বিলোপ, দাম বেঁধে দেওয়ার একক রাষ্ট্রীয় নীতি ইত্যাদি।

বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলির কৃষক আন্দোলনের একটি লক্ষণীয় দিক হল সামাজিক মেরুপ্রান্তিকতার সুস্পষ্ট প্রকাশ। এক্ষেত্রে গ্রামীণ মেহনতিদের বিভিন্ন ধারার সংগ্রাম সংগঠিত রূপলাভে চেষ্টিত। বিশেষ করে এটা চোখে পড়ে কৃষি প্রলেতারিয়েতের প্রয়াসে। ভারতে দেখা দিয়েছে ক্ষেত মজুরদের জাতীয় সমিতি যা কৃষক সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, মালয়েশিয়ায় আবাদের মেহনতিদের জাতীয় ইউনিয়ন আছে, যা ট্রেড ইউনিয়নগুলির জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে সংগঠনের উচ্চ মানে পৌঁছেছে লাতিন আমেরিকার, এশিয়ার বহু এবং আফ্রিকার বেশ কিছু দেশের কৃষকেরা। তাদের গণতান্ত্রিক সংগঠন সৃষ্টিতে সূচিত

হচ্ছে যে কৃষকেরা শোষক শ্রেণীদের প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের দাবির জন্য স্বাধীন সংগ্রাম শুরু করছে।

তবে অধিকাংশ দেশেই কৃষকদের মুলাংশটা এখনো অসংগঠিত এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে কম সক্রিয়। গ্রামের নিচুতলা — ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন চাষি, ক্ষুদে ইজারাদাররা সামাজিক-অর্থনৈতিক বিবর্তনের গতিপথেই এগিয়ে আসছে কৃষক আন্দোলনের সামনে। কিন্তু ঠিক এই নিচুতলাটাই রাজনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে অবিকশিত, চিরাচরিত নানা কুসংস্কারে সংক্রামিত, অজ্ঞ। কৃষক আন্দোলনে দৃঢ়তার অভাব আছে। দরিদ্রতম স্তরগুলি সমেত কৃষকদের একাংশ প্রতিবিপ্লবীদের সমর্থন করছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রামে কৃষকদের ক্রিয়াকর্মের ঐক্য অর্জিত হবে কি না, তার ওপর নির্ভর করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পরবর্তী কর্তব্য সম্পাদনের সাফল্য। আর সেটাও আবার নির্ভর করে সদ্যোমুক্ত দেশের অত্যধিকাংশ যে জনগণ, সেই কৃষকেরা কার পেছনে যাবে, তার ওপর।

কৃষক আন্দোলনে ক্রমেই বেশি করে ভূমিকা নিতে শুরু করেছে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি। এদিক থেকে ভারতীয় কমিউনিস্টদের কৃতিত্ব যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। বহু বছর ধরে কেরলা রাজ্যের পরিচালনায় থেকেছেন কমিউনিস্ট কর্মী। এ রাজ্যে গৃহীত কৃষি পলিসি কার্যে পরিণত হচ্ছে সাফল্যের সঙ্গে। প্রধান কৃষক

সংগঠন — সারা ভারত কৃষক সভা আর ক্ষেত মজুর সমিতিতে নেতৃভূমিকা নিয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ফিলিপাইনে কমিউনিস্টদের উদ্যোগে কাজ চালাচ্ছে গ্রামীণ মেহনতিদের প্রভাবশালী সংগঠন — স্বাধীন কৃষক লীগ। কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে তুলেছে তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টি। কৃষকেরা আবার সমর্থন করেছে ধাতু কর্মীদের ধর্মঘট যার নেতৃত্বে ছিল কমিউনিস্টরা। কমিউনিস্ট আর কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগের অনুরূপ দৃষ্টান্ত অন্যান্য দেশেও বিদ্যমান।

সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলির কৃষক আন্দোলনে একটা নতুন মর্মার্থ সঞ্চারিত হয়। এখানে প্রধান হয়ে দাঁড়ায় বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে গ্রামীণ মেহনতিদের সহযোগিতার প্রশ্ন, অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের কর্মসূচি রূপায়ণে একত্র ক্রিয়াকলাপ। এসব দেশে কৃষি পুনর্গঠনের সাধারণ কতকগুলি দিক আছে। সর্বাগ্রে সেটা হল সব ধরনের প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের মূলোৎপাটন, ভূমি সমস্যার গণতান্ত্রিক সমাধান, সামন্ততন্ত্রীদের সঙ্গে সংগ্রাম। গ্রামে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ আটকে রাখা, গ্রামীণ বুর্জোয়া উঁচুতলাকে সীমিত করার পথ নেওয়া হয়। তাছাড়া এখানে বিকশিত হতে থাকে কৃষকদের নানা ধরনের সমবায়, গ্রামের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য কাজে লাগানো হয় যৌথ কর্মের ঐতিহ্য। মেহনতি কৃষকদের রাজনৈতিক সমাবেশ, তাদের সাবলম্বন, উদ্যোগ জাগিয়ে তোলা — এই হল অপুঁজিতান্ত্রিক কৃষি পলিসির

নিশ্চিত, খোদ কৃষকদেরই স্বার্থরক্ষার সবচেয়ে কার্যকরী উপায়।

যেমন কৃষি সমস্যার সফল সমাধান, তেমনি সমগ্রভাবে সদ্যোমুক্ত দেশের প্রগতিশীল সামাজিক পুনর্গঠনের অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল **শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে জোট বন্ধনের** সমস্যাটির সঠিক সমাধান। এরূপ জোটের অটল ভিত্তি হল শ্রমিক শ্রেণী আর কৃষকদের অত্যধিকাংশের মূল স্বার্থের অবজেকটিভ সমাপতন।

তবে এ সমস্যার সমাধানে বিশিষ্ট কিছু মুশকিল থাকে। তার মধ্যে প্রধান ব্যাপার হল শ্রমিক শ্রেণীর দুর্বলতা, বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে, তাদের সংখ্যাল্পতা, খণ্ডবিখণ্ডতা, এবং তজ্জনিত ভাবাদর্শীয় অদৃঢ়তা। সেইসঙ্গে গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত বেশ সংখ্যাবহুল হলেও কম সচেতন, নিরক্ষর।

উন্নয়নশীল দেশে শহর আর গ্রামের মেহনতিদের জীবনযাত্রায় রীতিমতো পার্থক্য থাকে। এর ফলে শহুরে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার বৈষয়িক মান সম্পর্কে প্রায়ই একটা বেঠিক ধারণার সৃষ্টি হয়: ওরা যেন খানিকটা বিশেষ সুবিধার অধিকারী। যেমন, বুর্জোয়া ভাবাদর্শে এইরকম একটা প্রবল প্রচার চলে যে আফ্রিকার শ্রমিক শ্রেণী অবিপ্লবী, তারা 'বুর্জোয়া হয়ে উঠেছে'। কিছু কিছু পশ্চিমী ভাবাদর্শী গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আফ্রিকার শ্রমিক শ্রেণীকে এমনকি

'শ্রমিক অভিজাত' বলে অভিহিত করেছেন।* আসলে আফ্রিকান শ্রমিক শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা গোছের কোনো কিছুই নেই। ব্যাপারটা হল এই যে আফ্রিকায় জনগণের মূলাংশের দারিদ্র্যের পটে শ্রমিকদের অবস্থাটা বেশ অন্যরকম দেখায়। ইদানীং বহু নবীন রাষ্ট্রেই শ্রমিকদের জীবনযাত্রার পরিস্থিতি বস্তুত অবনতই হয়েছে। খাদ্যদ্রব্যের এবং একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কেবলই চড়ছে। জীবনধারণ হয়ে উঠেছে দুর্মূল্য। মজুরি বৃদ্ধি যে শ্রমিকদের প্রধান দাবি হয়ে উঠেছে, সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়। 'সাধারণভাবে শহরের', 'সাধারণভাবে শ্রমিকদের' তথাকথিত সুবিধা আসলে হল জটিলতর এবং উচ্চ উৎপাদনশীল শ্রমের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্ব।

অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী দাঁড়ায় কৃষকদের নয় পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে। কৃষি সমস্যার সমাধানে খোদ কৃষকদের চেয়েও প্রলেতারিয়েত কম আগ্রহী নয়, কেননা আমূল কৃষি সংস্কার ছাড়া জাতীয় অর্থনীতির পাকাপোক্ত বনিয়াদ গড়া, জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। আর এইসব লক্ষ্যের জন্য সর্বাধিক সঙ্গতিপরায়ণ ও দৃঢ়সংকল্প যোদ্ধা হল প্রলেতারিয়েত।

উন্নয়নশীল দেশের প্রলেতারিয়েতের সামাজিক শক্তি ও গুরুত্ব কেবল তার বিকাশের অভ্যন্তরীণ নিয়মবদ্ধতা

---

* দ্রষ্টব্য: G. Arrighi, J. Saul. Essays on the Political Economy of Africa, New York—London, 1973.

দিয়েই নির্ধারিত নয়। বিশ্ব সমাজতন্ত্র, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের বৈপ্লবিক প্রভাবও থেকে তার পেছনে। প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক প্রভাব কার্যকৃত হয় বিশ্বে সমাজতন্ত্রের অনুকূলে শক্তি অনুপাতের আমূল পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাহায্য মারফত।

সামাজিক পুনর্গঠনের অগ্রবাহিনী হয়ে ওঠা শ্রমিক শ্রেণীই সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রামে সদ্যোমুক্ত দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম।

সদ্যোমুক্ত দেশগুলির অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় **আন্তর্জাতিক কারিকাটা** ক্রমেই হয়ে উঠছে একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। জাতীয় মুক্তি শক্তির এক-একটা বাহিনীর পক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিকগুলিকে নমনীয়ভাবে মেলাতে পারার ওপরেই অনেকখানি নির্ভর করে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার গতি। উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদ ক্রমেই টেনে আনছে জনগণের পক্ষে সর্বনাশা অস্ত্র প্রতিযোগিতার মধ্যে। বছরে বছরে বাড়ছে তাদের সামরিক ব্যয়। অনুৎপাদক ব্যয়ে বাজেট ভারাক্রান্ত করে, সামরিক বরাদ্দের বোঝা ব্যাপক জনগণের কাঁধে চাপিয়ে একসারি উন্নয়নশীল দেশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে অস্ত্রের বড়ো বড়ো খরিদ্দার।

পারমাণবিক প্রলয় দূর করা, অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ক্ষান্তি দেওয়া, শান্তির জন্য সমস্ত দেশের মেহনতিদের একত্র অভিযানের গুরুত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে অসাধারণ।

ট্রেড ইউনিয়নগুলির দশম বিশ্ব কংগ্রেসে শান্তির জন্য ট্রেড-ইউনিয়ন ক্রিয়াকর্মের যে দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য বিপুল। মেহনতিদের এইসব বিক্ষোভ হল উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনগণের রাজনৈতিক ও সাধারণ গণতান্ত্রিক চেতনার মান উন্নয়নের অসাধারণ ফলপ্রদ উপায়।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নিকট সদ্যোমুক্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক পরনির্ভরতায় এইসব দেশের অভ্যন্তরীণ প্রগতিশীল শক্তির সংহতি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। উন্নয়নশীল দেশগুলির বৈদেশিক ঋণ বেড়েই চলেছে। বাড়ছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের নিকট তজ্জন্য প্রদেয় টাকা। অর্থনৈতিক বিশ্ব সংকটের পরিস্থিতিতে বিশ্ব বাজারে উন্নয়নশীল দেশগুলির পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের দাম পড়ে যাচ্ছে।

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ এই পরিস্থিতি কাজে লাগাচ্ছে সদ্যোমুক্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা বাড়িয়ে তোলা এবং তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পলিসির ওপর রূঢ় চাপ দেবার জন্য। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ প্রায়শই প্রতিক্রিয়াশীল আমল এবং গণতন্ত্রবিরোধী কু'দেতার পোষকতা করে থাকে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট হল **নতুন অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার** জন্য সংগ্রাম। নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থা, শিল্পোন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে

অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলির অসমান অবস্থার বিলোপ এবং তাতে করে দ্রুত সামাজিক অগ্রগতির জন্য তাদের প্রয়াস প্রকাশ পাচ্ছে এতে।

নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদে এবং জাতীয়করণের অধিকার সমেত সমস্ত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রতিটি রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ ও অলঙ্ঘ্য সার্বভৌমত্বের নীতিতে। বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির কাজকর্মের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়নশীল দেশগুলির রপ্তানি ও আমদানি মালের দামের মধ্যে ন্যায্য অনুপাত, কোনোরকম রাজনৈতিক ও সামরিক শর্ত বিনা অর্থনৈতিক সাহায্য ইত্যাদির কথাও আছে তাতে।

অর্থনৈতিক বিশ্ব ব্যবস্থায় সত্যকার আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপনের পথে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ একটা উৎক্রমণ পর্যায় হল নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য জাতীয় মুক্তি শক্তিগুলির সংগ্রাম। এ সংগ্রাম কঠিন হয়ে উঠছে খাস আন্দোলনটিরই অসমরূপিতা, ভূতপূর্ব উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির মধ্যে সামাজিক-রাজনৈতিক বিভিন্নতা বৃদ্ধির দরুন। কিছু দেশ আক্রমণাত্মক নীতির, সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়ার স্বেচ্ছাচার সংকোচনের পক্ষপাতী। অন্য কিছু দেশ আবার চলেছে আপোসের পথে, সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান বজায় রাখা, এমনকি শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে

কিছু আংশিক ছাড় দেবার প্রয়োজনীয়তা যারা মানে, তেমন পশ্চিমী মহলের কাছাকাছি থাকছে।

নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতিগুলি কার্যকৃত করার সংগ্রামে উন্নয়নশীল দেশগুলি নির্ভর করে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান সমর্থনের ওপর। উন্নয়নশীল দেশগুলির দুঃসহ ঔপনিবেশিক দায়ভাগের জন্য সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্র উভয়েই সমান দায়ী (একদিকে যেমন পুঁজিতন্ত্র তেমনি সমাজতন্ত্রকে নিয়ে 'ধনী উত্তর' আর অন্যদিকে 'দরিদ্র দক্ষিণ' অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশেরা), এই যে তত্ত্ব পেশ করে বুর্জোয়া ভাবাদর্শী এবং কিছু কিছু উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধিও, সেটা একেবারে ঠিক নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন বা সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির কোনো দেশই অতীতেও ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনে অংশ নেয় নি, বৈদেশিক একচেটিয়া পুঁজির পক্ষ থেকে বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলির যে শোষণ চলছে, তারও সরিক তারা নয়।

পুরনো হয়ে যাওয়া বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্পর্কের আমূল পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রাম বর্তমানে জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, গণতান্ত্রিক সংগ্রামের একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারা। বহু পরিমাণে তার সাফল্য নির্ভর করে গণতন্ত্র, জাতীয় মুক্তি, সামাজিক প্রগতির সমস্ত শক্তির সহযোগিতার মানের ওপর।

সদ্যোমুক্ত দেশগুলির জনগণের নতুন সাফল্যের গ্যারান্টি হল বর্তমানের সমস্ত বৈপ্লবিক শক্তির

আন্তর্জাতিক একাত্মতা ও সহযোগিতার আরো সংহতি।

৩। বর্তমান শ্রেণী সংগ্রামে সমাজতন্ত্রের ভূমিকা

বৈরী শ্রেণীতে সমাজের যে ভাগাভাগি, চিরকালের জন্য তার অবসান ঘটিয়েছে সমাজতন্ত্র। বৈরবিরোধ সমাধানের উপায় হিশেবে শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্ব নেই পরিণত সমাজতান্ত্রিক সমাজে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে কোনোরকম মুশকিলই থাকে না। অন্য সমস্ত সমাজের মতো সমাজতন্ত্রেও বিরোধ থাকে এবং থাকবে, তবে সে বিরোধ সামাজিক বৈরিতার চরিত্র ধারণ করে না, তার মীমাংসা হয় সামাজিক শ্রেণী ও গ্রুপগুলির যৌথ সম্পর্কে, জনগণের সামাজিক-রাজনৈতিক ঐক্যের পরিস্থিতিতে।

কিন্তু বিজয়ী সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে শ্রেণী বৈরের অনস্তিত্ব মানে মোটেই এই নয় যে বর্তমানের শ্রেণী সংগ্রামে সমাজতন্ত্রের কোনো ভূমিকা নেই। **বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার চালিকা বাহিনী, প্রধান শক্তি হিসেবে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রভাবিত করে শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশকে, বর্ধিত করে তাকে।**

বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া হল তার ঐক্যে, সামূহিকতায় বৈপ্লবিক গতি। তার উপাদান হল: সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, জাতীয় মুক্তি, উপনিবেশবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লব, সামন্ততন্ত্রবিরোধী গণতান্ত্রিক জনবিপ্লব, গণতন্ত্রের জন্য, ফ্যাসিস্ট এবং অন্যান্য

অত্যাচারী আমল উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম। বিভিন্ন এবং প্রায়শই অসম প্রকৃতির গণ আন্দোলনগুলির এমন একটি বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় মিলন, শেষ পর্যন্ত যা পুঁজিতন্ত্রবিরোধী ধারায় পর্যবসিত হয় — এই হল বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য।

বিশ্ব বৈপ্লবিক আন্দোলনের চালিকা বাহিনী, কেন্দ্র হল বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সংগ্রামী জনগণকে সর্বতোরূপে সমর্থন নিজেদের আন্তর্জাতিক কর্তব্য বলে গণ্য করে সমাজতান্ত্রিক দেশেরা। বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার গতিতে, অন্যান্য দেশে শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশে সমাজতন্ত্রের দুনিয়া ক্রমেই বেশি করে প্রভাব ফেলছে সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে নিজেদের সৃকৃতি দিয়ে। এ প্রভাব নির্ভর করে যেমন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ অবস্থা, তেমনি তাদের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতির ওপর।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনীতি বিকশিত হচ্ছে অবিরাম এবং উঁচু হারে, সুসম্পূর্ণ ও সুগভীর হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র, বেড়ে উঠছে জনগণের জীবনযাত্রার বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মান। প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পাকাপোক্ত সম্পর্ক। এসবের ফলে দৃঢ় হয় সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাস, সারা বিশ্বে বৈপ্লবিক শক্তিগুলি অতি কার্যকর সমর্থন লাভ করে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, টেকনিকাল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব পুঁজিতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক শ্রেণী এবং সাম্রাজ্যবাদের

বিরুদ্ধে সংগ্রামী জনগণের ওপর বৈপ্লবিক প্রভাব ফেলে। দুই বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতায় পুঁজিতন্ত্রের চেয়ে সমাজতন্ত্রের যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাচ্ছে, তাতে প্রভাবিত হচ্ছে পুঁজিতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মেহনতিদের দাবির চরিত্র, শ্রেণী সংগ্রামের রূপ ও পদ্ধতি। বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলি প্রলেতারিয়েত ও সমস্ত মেহনতিদের বৈপ্লবিক চেতনার পরিপক্কতায়, একচেটিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামী শক্তিদের সংহতি সাধনে সাহায্য করে।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার বিকাশ হল তেমন সমস্ত শোষিত ও নিপীড়িতদের শ্রেণী সংগ্রামের একটি মূলাঙ্গ, যারা মানুষের উপযুক্ত সামাজিক পরিস্থিতি গড়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাফল্য, মানবজাতির যে অগ্রগতি তা ঘটাচ্ছে, তা বিশ্বায়তনে শ্রেণী শক্তির অনুপাত আমূল বদলে দিচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণের অবস্থান সুদৃঢ় করছে।

পুরো একসারি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ে শ্রেণী শক্তির অনুপাতে একটা অমোঘ পরিবর্তন ঘটেছে, গড়ে উঠেছে পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় সংগ্রামের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিজয়ে রীতিমতো দৃঢ় হয়েছে প্রলেতারিয়েতের ভাবাদর্শীয় অবস্থান। রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় ও পুঁজির নিগড় থেকে মুক্তির জন্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নির্ধারক ভূমিকায় কার্যত

নিঃসন্দেহ হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী।

সমস্ত প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভাবাদর্শে ঘটনার গতিপথে ক্রমবর্ধমান প্রভাব ফেলছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। তবে মানব সমাজ বিকাশের নির্ধারক কারিকায় সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার পরিণতিটা কেবল একদফার একটা ব্যাপার নয়। এ হল বহুমুখী ও দীর্ঘকালীন একটা প্রক্রিয়া। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক ধরনের জীবনযাত্রার অনুগামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, জনগণের বৈপ্লবিক মুক্তি আন্দোলনের ফ্রন্ট প্রসার।

বলাই বাহুল্য নানা কারণে বিশ্ব সমাজতন্ত্রের প্রভাব কতকগুলি দেশে বাড়তে পারে, আবার কতকগুলি দেশে কমতেও পারে। কিন্তু সমগ্রভাবে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাব ক্রমেই সুগভীর ও সর্বাঙ্গীণ হয়ে উঠছে। বর্তমানে মানবিক ক্রিয়াকলাপের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, বিশ্বে এমন কোনো দেশ নেই যেখানে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বিশ্ব সমাজতন্ত্রের পুনর্গঠনমূলক প্রভাব পড়ছে না।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ওপর বিপুল প্রভাব ফেলছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সমুন্নয়ন, উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধি, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, সমাজতন্ত্রের নৈতিক মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠতা প্রবল করে তুলছে সারা বিশ্বের মেহনতিদের ওপর সমাজতন্ত্রের প্রভাব।

লোকে এখন সমাজতন্ত্রের কদর করতে পারে কেবল তার কর্মসূচি আর ধ্বনি বিচার করেই নয়, সমাজকে, মানুষকে তা বাস্তবে কী দিচ্ছে, তাই দেখেও। উন্নত যেসব দেশে প্রলেতারিয়েত অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাধিক, যেমন সেখানে, তেমনি যেসব দেশে প্রলেতারিয়েত সবে জন্ম নিচ্ছে, সেখানেও সমাজতন্ত্র ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করছে। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশে পুঁজিতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক লালন সহজ হয়।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার প্রভাবে বিশ্বের বিকাশে নতুন কতকগুলি নিয়মবদ্ধতা দেখা দিয়েছে, তার হিসেব না রাখলে পুঁজিতান্ত্রিক দেশে যেসব প্রক্রিয়া চলেছে তার অনেকগুলিকেই বোঝা সম্ভব হবে না। বিশ্ব সমাজতন্ত্রের প্রভাবেই পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি শ্রেণী সংগ্রামে মেহনতিদের কাছে নতি স্বীকার করে, তাদের বেতন বাড়ায়, শ্রমের পরিস্থিতি উন্নত করে, চালু করে পেনশনের ব্যবস্থা। বিশ্ব ঘটনাবলির গতিতে, মেহনতিদের শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশে সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা প্রধান প্রভাব ফেলে তাদের অর্থনৈতিক সাফল্য দেখিয়ে। মানবিক ক্রিয়াকলাপের নির্ধারক ক্ষেত্রে, বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্র হার মানছে সমাজতন্ত্রের কাছে।

বিশ্ব মঞ্চে নতুন শক্তি অনুপাতে প্রভাবিত হচ্ছে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের রূপও। বলাই বাহুল্য সর্বাগ্রে তা নির্ধারিত হয় নির্দিষ্ট দেশটিরই শ্রেণী শক্তির বিন্যাস দিয়ে। তবে বর্তমান কালের

বৈশিষ্ট্য হল শ্রেণী সংগ্রামের সমস্ত রূপ, জীবনের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পথ ও পদ্ধতির ওপর বিশ্ব সমাজতন্ত্রের বর্ধমান প্রভাব।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ওপর বিপুল প্রভাব ফেলছে সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা। বিশ্ব সমাজতন্ত্রের বিজয়ে জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামী জনগণের সামনে খুলে গেছে নতুন পরিপ্রেক্ষিত। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পোষকতাকে সর্বদাই নিজেদের একটা বড়ো কর্তব্য বলে গণ্য করেছে। তাদের পক্ষ থেকে অবিরাম সর্বাঙ্গীণ বৈষয়িক সাহায্য ও নৈতিক সমর্থন পেয়ে এসেছে সংগ্রামী জনগণ। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার জনগণের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মৈত্রী নির্ভর করে শান্তির জন্য, যেকোন রূপের ঔপনিবেশিকতা ও নয়া-ঔপনিবেশিকতা দূর করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে স্বার্থের মিলের ওপর। তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে একেবারেই নতুন সব সম্পর্ক: পরিপূর্ণ সমাধিকার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর তা প্রতিষ্ঠিত। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে জোট বাঁধার ফলে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির নিষ্ক্রিয় উপকরণ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীন কারিকায় পরিণত হওয়া সহজ হয় নবীন রাষ্ট্রগুলির পক্ষে। বিশ্ব মঞ্চে তাদের ভূমিকা রীতিমতো বেড়ে উঠেছে।

সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির রাষ্ট্রগুলি থাকায় ঔপনিবেশিক পীড়ন থেকে মুক্ত দেশেদের পক্ষে

সমাজের অর্থনৈতিক জীবন সংগঠনের পথ ও পদ্ধতির তুলনা ও নির্বাচন সম্ভব হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে উৎপাদনী শক্তি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রখর বিকাশ, পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাদের সাফল্য হয়ে উঠছে নবীন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির কাছে একাগ্র মনোযোগের কেন্দ্র। এসব রাষ্ট্রের জনগণ নিজেদের আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপায়ণ দেখতে পাচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে। সমাজের সম্মুখস্থ কর্তব্য সাধনের নির্ভরযোগ্য পথ তাদের দেখাচ্ছে বিশ্ব সমাজতন্ত্র। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অনেক কর্মকর্তাই সমাজতন্ত্রের দিকে ব্যাপক জনগণের এই টানটা উপেক্ষা করেন নি, এখন সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের ধ্বনি দিচ্ছেন তাঁরা। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ক্রমেই বেশি করে মন দেওয়া হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, নতুন সমাজ নির্মাণের তাত্ত্বিক সমস্যার আলোচনায়।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ওপর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাব বেড়ে উঠছে এইজন্য যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সক্রিয় সংগ্রাম চালাচ্ছে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশগুলির অধিকার ও স্বার্থের জন্য। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বৈদেশিক নীতিতে সাম্রাজ্যবাদের ক্রিয়াকলাপ বহুলাংশে বিকল হয়ে পড়ে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য হয়। রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা থেকে বেরিয়ে আসতে তা সাহায্য করে, জাতীয় সার্বভৌমত্ব সংহত করার অনুকূল সুযোগ করে দেয়। ঔপনিবেশিক

আমলের অবশেষ উচ্ছেদের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলি যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করে, সেগুলির সক্রিয় সমর্থনের পক্ষে দাঁড়ায় সমাজতান্ত্রিক দেশেরা।

সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সাফল্য ও অভিজ্ঞতায় অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে বহুমুখী ও ব্যাপকতর পোষকতা সম্ভব হয়। এতে সাম্রাজ্যবাদের নতুন গোলামি এড়াতে সাহায্য হয় নবীন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির, প্রগাঢ় যেসব অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় এসব দেশ সামাজিক বিকাশের রাজপথে এসে দাঁড়ায় তার গভীরতা ত্বরিত হয়। সদ্যোমুক্ত দেশগুলির শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, আর সেখান থেকে নেয় তাদের চিরাচরিত রপ্তানি দ্রব্য, তার ফলে সদ্যোমুক্ত দেশগুলির বাণিজ্যিক ও বৈদেশিক দেনা-পাওনার ব্যাপারে সুবিধা হয়, সুবিধাজনক শর্তে ঋণ ও ক্রেডিট পায় তারা। ঋণ ও ক্রেডিট, সাজসরঞ্জাম রপ্তানি, টেকনিকাল অভিজ্ঞতা সম্প্রদানে সমাজতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের একচেটিয়া দূর করায় পশ্চিমী পুঁজি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক শোষণের বর্বর ও অনাবৃত ধরনগুলি পরিহারে বাধ্য হয়, একাধিক ক্ষেত্রে ক্রেডিটের সুদ কমায়, ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়ায়। নবীন জাতীয় রাষ্ট্রগুলিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষ থেকে এটা একধরনের পরোক্ষ সাহায্য।

উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে বিপুল তাৎপর্য ধরে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল সাহায্য। জাতীয় পুনরুজ্জীবনের জন্য বিদ্যুৎশক্তি,

যান্ত্রিক প্রকৌশল, আধুনিক টেকনোলজি, নির্মাণঘটিত ও রাসায়নিক শিল্পের আশ্রয় নিতে শিল্পায়ন ও বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের সমস্ত ধাপ পেরিয়ে আসার প্রয়োজন পড়ছে না নবীন রাষ্ট্রগুলির। সবকিছু নতুন করে উদ্ভাবনের দরকার নেই তাদের। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিজ্ঞান ও টেকনিকের সর্বাধুনিক কৃতিত্ব কাজে লাগাতে পারে তারা।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলির সংগ্রামে ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক। এইসব দেশকে সর্বাগ্রে দেওয়া হচ্ছে শিল্প, শক্তি-ইঞ্জিনিয়ারিং, পরিবহণ, কৃষির যন্ত্রপাতি। ইদানীং প্রাকৃতিক সম্পদের যৌগিক আয়ত্তি, প্রসেসিং শিল্পের বিকাশে সহযোগিতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির জাতীয় কর্মী প্রস্তুতিতে যথেষ্ট সাহায্য করছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি। সমাজতন্ত্রের দেশগুলিতে শিক্ষালাভ করছে উন্নয়নশীল দেশগুলির বহু সহস্র উচ্চশিক্ষার্থী ও গবেষক।

ইদানীং সদ্যোমুক্ত দেশগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বাণিজ্যিক-অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তি হয়েছে অনেক। এইসব চুক্তি কার্যকৃত হলে উন্নয়নশীল দেশগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রতিহত করে তাদের স্বাধীনতা সংহতির গতিবেগ প্রবল করে তোলার পরিস্থিতি গড়ে উঠবে।

প্রাক্তন ঔপনিবেশিক ও পরনির্ভর দেশগুলির সঙ্গে

সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতা এত খরবেগে বাড়ছে যে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমান আন্তর্জাতিক জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সমাধিকার ও পারস্পরিক সুবিধা তার বৈশিষ্ট্য। রপ্তানি ও ক্রেডিট দান, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল সহায়তার বিনিময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এইসব দেশ থেকে পায় তার জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্য: ধাতু, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফলমূল, বস্ত্র, পাদুকা, ঔষধ ইত্যাদি। খুবই তাৎপর্য লাভ করছে উৎপাদনী সহযোগ, বিশেষত এমন সব উদ্যোগ স্থাপন যার উৎপন্ন দ্রব্যে উভয় পক্ষই আগ্রহী। শিল্পোন্নত শক্তি আর সদ্যোমুক্ত নবীন দেশগুলির মধ্যে এই ধরনের সহযোগিতা হল অর্থনীতির ক্ষেত্রে সত্যসত্যই ন্যায্য সম্পর্কের দৃষ্টান্ত, নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য সংগ্রামে বাস্তব অবদান।

পশ্চিমের পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগের মতোই উন্নয়নশীল দেশগুলিকে গণ্য করতে চায় কাঁচামাল আর অতি মুনাফার উৎস, নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার বলে, অর্থনৈতিক ডামাডোল আর অস্ত্র প্রতিযোগিতার বোঝা চাপাতে চায় তাদের ঘাড়ে, নিজেদের সামরিক রণনীতির পাকে তাদের জড়াবার চেষ্টা করে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রদের সহযোগিতায় অবজেকটিভ ক্ষেত্রে শক্তিশালী হয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্ট, উত্তেজনা প্রশমন ও সামাজিক প্রগতির স্বার্থ পুষ্ট হয় তাতে। সমাজতান্ত্রিক জগতের

সমর্থনের ফলে উন্নয়নশীল দেশের জনগণের পক্ষে অপুঁজিতান্ত্রিক পথ গ্রহণ সম্ভব হয়। এসব দেশের জনগণ নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় ক্রমেই নিঃসন্দেহ হয়ে উঠছে যে পুঁজিতন্ত্র তাদের ওপর কেবল নতুন রূপের জবরদস্তি চাপাচ্ছে। সেই সঙ্গে তারা এটাও বোঝার সুযোগ পাচ্ছে যে এই চাপকে প্রতিহত করা, নিজেদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা জয় করা সম্ভব কেবল নিজেদের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ এবং বিশ্ব সমাজতন্ত্রের দেশগুলির সমর্থনের ওপর নির্ভর করে।

বিশ্ব সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও গুরুত্ব বৃদ্ধিতে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অপুঁজিতান্ত্রিক পথে বিকাশ, সমাজতন্ত্রমুখিতার জন্য আন্দোলন ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠেছে। বলাই বাহুল্য সমাজতন্ত্রমুখিতায় উত্তরণ আপনা আপনি ঘটে না। এটা একরোখা শ্রেণী সংগ্রামের ফল। সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থার ভূমিকা এক্ষেত্রে এই যে জাতীয় ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, প্রগতিশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠন এবং শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রমুখিতার জন্য নানা ধরনের শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশে তা সহায়তা করে।

এইভাবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা হল সেই শক্তি যা পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে, তথা এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশে শ্রেণী সংগ্রাম বিকাশে বিপুল সাহায্য করছে। এতে করে বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় নিজের অগ্রণী ভূমিকার প্রমাণ দিচ্ছে সমাজতন্ত্র।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রেণীহীন সমাজের পথে

মানবসমাজের বিকাশ শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। ধনী ও দরিদ্র, শোষক ও শোষিতের অস্তিত্ব এবং তাদের মধ্যে অবিরাম সংগ্রাম একটা ঐতিহাসিক ঘটনা যা বহুযুগ ধরে সামাজিক প্রগতির একটা অচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। তবে ঐ ইতিহাসই আবার দেখায় যে শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম সর্বদা ছিল না। আদি কালে এবং মানবজাতির বিকাশের একটা অতি সুদীর্ঘ সময় ধরে শ্রেণী বিভাগ ছিল না। সমাজ বিকাশের নিয়ম অনুসারে শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের উদ্ভব হয়েছিল যে অনিবার্যতায়, সেইভাবেই তা বিলুপ্তও হবে।

শ্রেণী বিলোপ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। সেটা হল শ্রেণী সংগ্রামের

উচ্চতম ধাপ এবং সেইসঙ্গে শ্রেণীহীন সমাজের পথে নির্ধারক পর্যায়।

সমাজতন্ত্রের বিজয় সমাজের অভ্যন্তরে বৈরী শ্রেণী এবং শ্রেণী সংগ্রাম বিলোপের সঙ্গে জড়িত। এটা হল সমাজতন্ত্রের একটা বিরাট এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিজয় যা সারা বিশ্বকে জাজ্বল্যমানরূপে দেখাচ্ছে অন্য সমস্ত সমাজের চেয়ে সমাজতন্ত্রের গুণগত শ্রেষ্ঠত্ব। এবং এ বিজয়ের কথা অস্বীকার করতে পারে না সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে কট্টর প্রতিপক্ষও।

তবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ বৈরী শ্রেণীদের বিলুপ্ত করেই থেমে যায় না। তার লক্ষ্য হল সাধারণভাবেই সমস্ত শ্রেণীর উচ্ছেদ এবং লোকেদের সত্যকার শ্রেণীহীন এমন মেল প্রতিষ্ঠা যাতে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ ও অবাধ বিকাশ নিশ্চিত হবে।

কিন্তু এ লক্ষ্য সাধন একটা দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া। এতে প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক সমাজের গঠন সুসম্পূর্ণ করে তোলার জন্য প্রচুর উদ্যোগ, আর এ সমাজ হল তার প্রকৃতিগত যোগাযোগ ও সম্পর্কাদির একটা জটিল অবয়ব।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এইরূপ সামাজিক কাঠামো রূপ নেয় তিরিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে, বিজয়ী সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে। তার পরে যে সময়টা কাটল তার ভেতরে প্রগাঢ় পরিবর্তন ঘটেছে। সোভিয়েত সমাজ প্রবেশ করেছে বিকশিত সমাজতন্ত্রের পর্যায়ে। এই পর্বে নতুন ব্যবস্থার প্রকৃতিগত যৌথতার নীতিতে সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ করা

হতে থাকে। এই পুনর্নির্মাণ চলে সমস্ত বৈষয়িক ও আত্মিক ক্ষেত্র, সামাজিক জীবনের গোটা ধাঁচটা নিয়ে। বিকশিত সমাজতন্ত্র গড়ায় বদলে যায় সমাজে শ্রেণীগুলির অবস্থা ও ভূমিকা, তাদের ক্রিয়াকলাপের চরিত্র, সামাজিক-অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক আদল। সমাজতন্ত্রের বর্তমান পর্যায়ে তার সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি হল বিকশিত সমাজতান্ত্রিক সমাজের চালিকা শক্তি হিশেবে শ্রমিক শ্রেণী এবং তার সহযোগী — সমবায়ী কৃষক আর জনগণের বুদ্ধিজীবী।

বিকশিত সমাজতন্ত্রের পর্যায় হল ইতিহাসের দিক থেকে সমাজ বিকাশের একটা সুদীর্ঘ পর্ব। সমাজতন্ত্র সুসম্পূর্ণ করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা সমস্যা ও কর্তব্য দেখা দেয় এই পর্যায়ে, তা যত সম্পূর্ণ হবে সমাজ ততই ক্রমশ এগিয়ে যাবে কমিউনিজমের দিকে।

সমাজতন্ত্রের সামাজিক কাঠামো আরো সুসম্পূর্ণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এইজন্য যে ব্যক্তিগত মালিকানা ও শোষক শ্রেণীরা এখানে বিলুপ্ত হলেও উৎপাদনের উপায়ের ক্ষেত্রে সমস্ত নাগরিকদের একই রকম মনোভাব এখনো পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সমাজের অভ্যন্তরে তখনো বর্তমান থাকে উল্লেখযোগ্য সামাজিক-শ্রেণীগত পার্থক্য। তার কারণ পুরনো শ্রম বিভাগের জের চূড়ান্তরূপে কাটিয়ে ওঠা যায় নি।

সমাজতান্ত্রিক মালিকানার দুই রূপ — সর্বজনীন ও যৌথখামারি-সমবায়ী রূপ থাকায় শ্রমিক শ্রেণী ও সমবায়ী কৃষকদের মধ্যেও পার্থক্য দেখা দেয়। এর

ফলে শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা হয় না পুরোপুরি একই রকম, বণ্টনের একই সমাজতান্ত্রিক নীতির আওতায় সামাজিক সম্পদের ভাগ পাওয়ার রূপ ও পরিমাণে কিছু পার্থক্য ঘটে।

সমাজতন্ত্রের সামাজিক কাঠামো শুধু শ্রেণীর কথাতেই চুকে যায় না, সামাজিক গ্রুপ ও স্তরও থাকে তাতে। সামাজিক শ্রমবিভাগে শহুরে ও গ্রাম্য জনগণ, প্রধানত শারীরিক আর প্রধানত মানসিক শ্রমের কর্মী, কর্মচারীদের মতো গ্রুপগুলিকে আলাদা করা সম্ভব। বৃহৎ, দ্রুত বর্ধমান একটা সামাজিক গ্রুপ হল সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের সম্পূর্ণীকরণ ও বিকাশের গতিপথে সামাজিক-শ্রেণীগত পার্থক্য ক্রমশ মুছে যেতে থাকে, তাতে সূচিত হয় শ্রেণী ও সামাজিক স্তরগুলির পুরোপুরি ও দ্রুত কাছিয়ে আসার প্রক্রিয়া, তার ফলে শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক সম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তথা এইসমস্ত সামাজিক গ্রুপের অভ্যন্তরেও সীমারেখাগুলির তীব্র প্রকটতা ও অতীত তাৎপর্য ধীরে ধীরে লোপ পায়। জীবনযাত্রা ও শ্রমের সাধারণ দিক ও পরিস্থিতির ভূমিকা বড়ো হয়ে উঠতে শুরু করে। এ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিণাম হল সমস্ত সামাজিক গ্রুপের মিলন ও বিগলন, পরিপূর্ণ সামাজিক সমগোত্রীয়তা প্রতিষ্ঠা। এটা হল সমাজতন্ত্রের বিকাশ ও কমিউনিজমে উত্তরণের সাধারণ নিয়মবদ্ধতা।

সমাজতান্ত্রিক সামাজিক-শ্রেণীগত পার্থক্যগুলি মিলিয়ে যায় নিম্নোক্ত ধারায়: শ্রমিক শ্রেণী ও সমবায়ী

কৃষক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ব্যবস্থায় তাদের অবস্থা, উৎপাদনী উপায়ের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে কাছিয়ে আসে; শ্রমের চরিত্র আর সাংস্কৃতিক-টেকনিকাল মানের দিক থেকে এইসব শ্রেণী আর বুদ্ধিজীবীরা কাছাকাছি আসতে থাকে; ক্রমশ বণ্টনের পার্থক্য বিলোপের পূর্বশর্ত গড়ে ওঠে: সমস্ত সামাজিক গ্রুপের জীবনযাত্রার পরিস্থিতি নিকটতর করে তোলার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এই সমস্ত প্রক্রিয়াই যেমন শহর ও গ্রামের মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক-জীবনযাত্রাগত পার্থক্য, তেমনি মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে সামাজিক ভেদ বিলুপ্ত করার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত।

এইসব প্রক্রিয়ার নির্ধারক বৈষয়িক ভিত্তি হল সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশ, বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল প্রগতি, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিকাশ ও সম্পূর্ণীকরণ। সাংস্কৃতিক জোয়ার বিশেষ করে জনশিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশও বিপুল গুরুত্ব ধরে।

এই প্রক্রিয়াগুলিতে বড়ো একটা ভূমিকা নিচ্ছে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সমুন্নয়ন, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যাপারাদির পরিচালনায় সমস্ত সামাজিক গ্রুপ ও স্তরকে আকর্ষণ। সামাজিক পার্থক্য মুছতে শুরু করছে সমগ্র সমাজের সামাজিক-রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শীয় ঐক্যের পরিস্থিতিতে। এই ঐক্যের আরো সংহতি ও বিকাশে শ্রমরতদের একক যৌথে শ্রমিক, কৃষক আর বুদ্ধিজীবীদের ক্রমিক মিলনে সাহায্য হয়।

শ্রেণী ও গ্রুপগুলির মধ্যে পার্থক্য মোছাটা শ্রেণী ও গ্রুপগুলির অভ্যন্তরীণ পার্থক্য অর্থাৎ শ্রমের প্রকৃতি, নিজেদের গুণ, শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পার্থক্য ঘোচানোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে এতে ধরে নেওয়া হয় দৃষ্টান্তস্বরূপ, অদক্ষ বা নিম্নদক্ষতার শ্রম বিলোপ, শ্রমের চরিত্রের দিক থেকে গ্রামীণ কর্মীদের শহুরে শ্রমিকদের কাছাকাছি আনা, ইত্যাদি। এর ভিত্তিতে চলেছে শ্রমিকদের বিভিন্ন গ্রুপের সাধারণ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক-টেকনিকাল প্রস্তুতির বিকাশ, পারিশ্রমিকের মান, জীবনযাত্রার পরিস্থিতি প্রভৃতির দিক থেকে সবাইকে নৈকট্যে আনয়ন।

এইভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রেণীহীন সমাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজন সর্বাগ্রে উৎপাদনী শক্তির অনেক উঁচু মানের বিকাশ, শ্রম ও উৎপাদনের চরিত্রে আরো পরিবর্তন, তার সামাজীকরণে উচ্চতর মাত্রা। তার জন্য দরকার উৎপাদনে বর্তমান বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের সুকৃতি পূর্ণাকারে প্রবর্তন, এইসব সুকৃতিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে মেলানো। এই ভিত্তিতে মালিকানার সামাজিক এবং যৌথখামারি-সামবায়িক রূপের বিভিন্নতা, সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণীগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের ক্রমাগত বিলোপ চলতে থাকবে। প্রক্রিয়াটার পরিপ্রেক্ষিত হল এই যে সমাজের শ্রেণীহীন গঠন রূপলাভ করবে সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক কাঠামোর মধ্যেই।

শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ হল নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিকাশের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক্‌স্তম্ভ। এই প্রসঙ্গে এই কথাটা বিশেষ করে তুলে ধরা উচিত যে শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের চালিকা শক্তি ছিল এবং থেকেই যাচ্ছে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী। শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজের রূপলাভ হল পরিপূর্ণ সামাজিক সমগোত্রীয়তার পথে একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়।

নবম অধ্যায়

জাতিতে জাতিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং শ্রেণী সংগ্রাম

বর্তমান কালের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির প্রধান কর্তব্য হল শান্তি এবং জাতিতে জাতিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য সংগ্রাম। কেবল আন্তর্জাতিক শান্তির পরিস্থিতিতেই শোষণ এবং বৈরী শ্রেণী বিলোপের মতো কর্তব্য সাধিত হতে পারে। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানেই কেবল শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশ এবং সমস্ত দেশেই উৎপীড়ক শ্রেণীর উচ্ছেদের মতো পরিস্থিতি গড়ে ওঠে।

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে বর্তমান রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শীয় সংগ্রামের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আর শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে সম্পর্কের সমস্যা। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের

নীতি যেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব, বিশ্ব শক্তিগুলির অনুপাতে আমূল পরিবর্তনের ফল, শ্রেণী সংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লব সেক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ বিরোধের পরিণাম। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরে বা আন্তর্জাতিক মঞ্চে কোথাও শ্রেণী সংগ্রাম বাতিল হয় না।

বর্তমানে বিশ্বের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি মানবসমাজ থেকে পারমাণবিক যুদ্ধ বর্জনের জন্য একাগ্র সংগ্রাম চালাচ্ছে। এই লক্ষ্যের জন্য সংগ্রামে, সে লক্ষ্য অর্জনে তো আরো বেশি করে বিপরীত সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির দ্বন্দ্বকে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার পথে সরিয়ে আনার মতো অনুকূল সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিপরীত সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলি স্বেচ্ছায় নিজেদের সামাজিক অবস্থান ও লক্ষ্য ছেড়ে দেবে, এ কথা ধরে নিলে অবশ্যই বাতুলতা হবে। কিন্তু শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি রক্ষা করা আবশ্যক, এতে সবচেয়ে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে একঘরে করা এবং সেই সঙ্গে প্রগতি ও গণতন্ত্রের শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করায় সাহায্য হয়। সাম্রাজ্যবাদীদের 'বুঝিয়ে সুঝিয়ে' আগ্রাসন ত্যাগে রাজি করানো সম্ভব হবে, এমন ভরসা রাখা নির্বুদ্ধিতা, কিন্তু এ কাজে তাদের বাধ্য করা পুরোপুরি সম্ভব।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ধরে নেওয়া হয়:

— রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদমূলক প্রশ্ন মীমাংসার উপায় হিশেবে যুদ্ধ বর্জন, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান;

— রাষ্ট্রগুলির সমাধিকার, পারস্পরিক সমঝওতা এবং আস্থা, পরস্পরের স্বার্থ মান্য করা;

— সমস্ত দেশের সার্বভৌমত্ব এবং ভূভাগের অখণ্ডতাকে কঠোরভাবে মেনে চলা;

— পরিপূর্ণ সমাধিকার ও পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার বিকাশ।

বলাই বাহুল্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বহির্নীতি কেবল পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানেই ফুরিয়ে যায় না। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ যোগাযোগের সংহতি, আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সাহায্য ও সমর্থনও তার অন্তর্ভুক্ত।

আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বাড়িয়ে এবং সামরিক জ্বালামুখগুলি খুঁচিয়ে তুলে নিজের অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও মুশকিল কাটিয়ে ওঠার সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াসে বাধা দেয় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি। **জাতীয় ও বিশ্ব পরিসরে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রাম বিকাশে তা সাহায্য করে।** সামরিক বিপদ হ্রাস, বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক লাভজনক অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ থাকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে।

বুর্জোয়া মতাদর্শীরা দাবি করে যে বুর্জোয়া ও প্রলেতারীয় ভাবাদর্শের মধ্যে সংগ্রাম নাকি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির বিরোধী। জাতিদের কেবল তখনই

শান্তিকামী বলে মানা যায় যখন শান্তির নামে তাদের কাছে ঘৃণার্হ ভাবাদর্শকে তারা সহ্য করে। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের প্রাথমিক শর্ত হিশেবে 'ভাবাদর্শীয় শান্তির' দাবি উপস্থিত করে বুর্জোয়া রাজনীতিকরা। এসবই প্রশ্নটির মিথ্যা উপস্থাপন।

ভাবাদর্শীয় সংগ্রাম চালানো হয় জাতিতে জাতিতে নয়, প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরে এবং বিশ্ব মঞ্চে শত্রু শ্রেণীগুলির মধ্যে। কোনোরকম নিষেধাজ্ঞা আর আপোস দিয়ে ভাবাদর্শীয় সংগ্রাম বন্ধ রাখা সম্ভব নয়, কেননা বিভিন্ন স্বার্থ আর উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রেণী বর্তমান। আর যতদিন শত্রু শ্রেণীরা থাকছে, ততদিন অন্তর্ধান করতে পারে না তাদের বিপরীত ভাবাদর্শ, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার ধারা, তাদের বিশ্ববীক্ষা। পীড়ন ও যুদ্ধের ভাবাদর্শে প্রলেতারিয়েত কদাচ সায় দিতে পারে না, আর বুর্জোয়াও ঐতিহাসিক মঞ্চ থেকে স্বেচ্ছায় সরে যেতে গররাজি। সাম্রাজ্যবাদী ভাবাদর্শের সঙ্গে সর্বাধিক সক্রিয় সংগ্রামে শান্তি রক্ষা ও সুদৃঢ় করার সাহায্য হয়। এ ছাড়া হতে পারে না: সাম্রাজ্যবাদের ভাবাদর্শ যুদ্ধ ও আগ্রাসনের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে, সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ শান্তি ও জাতিতে জাতিতে মৈত্রীর নীতিকে জয়যুক্ত করার জন্য লড়ছে।

'ভাবাদর্শীয় মিটমাটের' কথাটা হাত-সাফাই করে চালালেও বুর্জোয়ারা মোটেই নিজেদের ধ্যান-ধারণা, কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের সঙ্গে সংগ্রাম ত্যাগের কথা মনেও ঠাঁই দেয় না। আজ প্রায় ১৪০ বছর ধরে বুর্জোয়া

মরিয়া সংগ্রাম চালাচ্ছে মার্কসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রেণী সংগ্রাম যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কমিউনিজম বিরোধিতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ততই ক্ষিপ্ত। তারই পতাকাতলে জয়গান করা হচ্ছে সমরবাদ, উপনিবেশবাদ, ফ্যাসিজম, যুদ্ধের।

বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা নিজেরাই ভালোই জানে যে ধ্যান-ধারণার মিটমাট হতে পারে না। অন্যথায় বুর্জোয়ারা যে বর্তমানে তাদের ভাবাদর্শীয় সংগ্রামের ফ্রন্টকে একগুঁয়ের মতো জোরালো করে তুলছে, কী তার ব্যাখ্যা। প্রচণ্ড বেড়ে উঠছে প্রচারযন্ত্র, তার জন্য অর্থবরাদ্দ। ক্রমেই প্রসার লাভ করছে কমিউনিস্টবিরোধী কুৎসা, সোভিয়েতবিরোধী অপপ্রচার। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম যেন কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ বুর্জোয়ার কৃপাভিক্ষা করে, তার মধ্যে গলে যায়, নিরস্ত্র হয়ে আত্মবিলোপ করে অন্যদিকে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ যেন লাভ করে অবাধ প্রচার। এরই স্বপ্ন দেখছে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া আর ভণ্ডামি করে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের' পক্ষে দাঁড়াচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, রাজ্যগ্রাসী যুদ্ধের উদ্ভব যে সামাজিক পরিস্থিতি ও শ্রেণীশক্তিগুলির ফলে, তার বিরুদ্ধে চালিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি, সমাজবিপ্লব ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিকাশে, সামাজিক প্রগতি, সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট নির্মাণের গতিবেগ ত্বরণে তা সাহায্য করে। শান্তি রক্ষা আর সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম একটা সাধারণ প্রক্রিয়া। বৈপ্লবিক শ্রেণী সংগ্রাম বাদ দিয়ে শান্তি সংগ্রামের

বুলিটা বুর্জোয়ার পক্ষ থেকে একটা জনপ্রতারণা মাত্র।

এমন একটা কথা শোনা যায় যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নাকি বিপ্লবের বিপরীত, শান্তির জন্য সংগ্রামে শ্রেণী সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হঠে যায়, হ্রাস পায় জনগণের বৈপ্লবিক উদ্দীপনা। এমনকি এই কথাই বলা হয় যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে লাভ হয় সাম্রাজ্যবাদের, আপোস হয় তাদের সঙ্গে আর শ্রেণী সংগ্রাম চাপা পড়ে। আসলে ব্যাপারটা একেবারেই তা নয়।

মার্কসবাদ কখনো মনে করে নি এবং করছে না যে কেবল যুদ্ধের ফলেই সামাজিক বিপ্লব দেখা দেয়, যুদ্ধই বিপ্লবের অপরিহার্য শর্ত ও কারণ। কোনো একটা দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে অবশ্য-অবশ্যই যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে হবে এমন নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিণত হয়েছে বিশ্ব বিকাশের নির্ধারক কারিকায়, যখন মুক্তি আন্দোলনের আঘাতে ধূলিসাৎ হয়েছে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, যখন বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণী তাদের অবস্থান সংহত করেছে দৃঢ়ভাবে, তখন বিশ্ব যুদ্ধ ছাড়াও জয়লাভ করতে পারে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

কৃত্রিমভাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঠেলে ঘটানো মার্কসবাদের কাছে বিজাতীয়, পরিণামে বৈপ্লবিক অগ্রবাহিনী বিধ্বস্ত হয় তাতে। সেই সঙ্গে 'শান্তি রক্ষার' নামে বিপ্লব পরিহারের প্রয়াসের বিরুদ্ধেও দৃঢ়ভাবে লড়ে মার্কসবাদ।

শান্তি রক্ষার অর্থ তার প্রধান শত্রু — সাম্রাজ্যবাদের

সঙ্গে আপোসহীন সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির পরাক্রম বৃদ্ধি, সাফল্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্র নির্মাণ, অবিচলে শ্রেণী সংগ্রাম, বৈপ্লবিক শ্রমিক ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বর্ধন। শান্তির জন্য আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে অসন্তুষ্ট বিপুল সংখ্যক জনগণকে স্বপক্ষে টেনে এনে সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করে এবং তার ফলে সারা বিশ্বে প্রবল করে তোলে বৈপ্লবিক সংগ্রাম।

বৈরগর্ভ সমস্ত ব্যবস্থা বিকাশের অবজেকটিভ নিয়ম হল শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিতদের সংগ্রাম। শোষিত আর শোষক, নিপীড়িত জাতি আর উপনিবেশপ্রভু, কমিউনিস্ট আর বুর্জোয়া ভাবাদর্শের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হতে পারে না। সশস্ত্র অথবা নিরস্ত্র, শান্তিপূর্ণ বা অশান্তিপূর্ণ, যেকোনো রূপে ও আত্মপ্রকাশে সংগ্রামেই পৌঁছনো যায় শোষক সমাজের ধ্বংসে, সামাজিক বিপ্লবে। অন্যদিকে আবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ে শান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বেশি করে সংহত হবে।

সমাজতন্ত্রের বিশ্বস্ত সহযোগী শান্তি। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থনীতি সুদৃঢ় করে তুলতে সাহায্য হয়, পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লাভ হয় সময়ের দিক থেকে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শগুলির প্রতিষ্ঠা বাড়ে। এ নীতিতে নতুন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব পুরোপুরি বিকশিত করে তোলার সুযোগ পায় সমাজতান্ত্রিক সহমিতালি।

অস্ত্রপ্রতিযোগিতা বাড়িয়ে তুলে, দুনিয়ার নানান

জায়গায় আগ্রাসনাত্মক স্থানীয় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে, ভাবাদর্শীয় অন্তর্ঘাতের সাহায্যে জনগণের সামাজিক প্রগতি আটকে রাখতে সাম্রাজ্যবাদ সচেষ্ট। নানা অছিলায় ভদ্রতার বালাই না রেখে 'স্বাধীন দুনিয়ার' ধ্বজাধারীরা কদর্য হস্তক্ষেপ করছে অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, মুক্তি আন্দোলন দমনে সামরিক পন্থার আশ্রয় নিচ্ছে, চেষ্টা করছে নয়া-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে মজবুত করতে।

সমাজতান্ত্রিক অবস্থানের শক্তিবৃদ্ধি এবং বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিকাশ নতুন বিশ্ব যুদ্ধ নিবারণের জন্য জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে আঙ্গিকভাবে জড়িত। বাস্তব জীবন প্রত্যয়জনকতার সঙ্গে দেখিয়ে দিচ্ছে যে শান্তি বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে দেয় যুদ্ধের চেয়ে অনেক সুষ্ঠুভাবে।

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন আর সামরিকতার ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাতাবরণ পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে জাতিবাদ আর শোভিনিজমের উদ্‌গার থেকে; শ্রমিক শ্রেণীর চারপাশে জনগণের ঐক্যে, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের শক্তি সংহতিতে সাহায্য হয়; মেহনতিরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে যুদ্ধের জন্য প্রধান অপরাধ একচেটিয়া পুঁজির, তাকে নির্মূল করা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বৃদ্ধিতে প্রতিক্রিয়ার মতলবই হাসিল হয়, মেহনতিদের প্রতারিত করতে পারে তারা। সমাজতন্ত্রের পক্ষ থেকেই 'যুদ্ধের বিপদ' এই আষাঢ়ে গল্পটা চালু করে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির শাসক মহলেরা ঘা মারছে মেহনতিদের আন্তর্জাতিক

ঐক্যে, কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলন দমন করছে।

স্বাধীন বিকাশের পথ নিয়েছে যেসব রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপকে সংযত রাখে শান্তির জন্য বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম। উন্নয়নশীল নবীন রাষ্ট্রগুলির ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক চাপ দেবার কোনো সুযোগ উপনিবেশ মালিকেরা ছাড়ে না। কিন্তু প্রতিবারই উন্নয়নশীল দেশেদের স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরা।

শান্তির অবস্থা তরুণ দেশগুলিকে এমন সব সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনর্গঠন চালিয়ে যেতে সাহায্য করে যাতে দৃঢ় হয় অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বনিয়াদ, জনগণের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির মান বাড়ে। এই থেকেই বোঝা যায় কেন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, শান্তির জন্য সংগ্রামের নীতি সদ্যোমুক্ত দেশের জনগণের কাছে অত সমাদৃত। এই নীতিকে তারা সঙ্গত কারণেই সংশ্লিষ্ট করে সাফল্যের সঙ্গে নবজীবন নির্মাণ, নিজেদের জাতীয় পুনরুজ্জীবনের গতিবেগ ত্বরণের সুযোগের সঙ্গে।

শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং তার সংহতিতে, আগ্রাসী যুদ্ধ হতে না দিতে বিশ্ব জনগণের যে আগ্রহ, সেটা একটা অবজেকটিভ ব্যাপার। আগ্রহটা আরো এই কারণে যে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বকে ঠেলছে স্রেফ কেবল আরো একটা যুদ্ধ নয়, পারমাণবিক যুদ্ধের দিকেই যাতে পৃথিবীতে মানব জীবন, মানবিক সভ্যতার অস্তিত্বই লোপ পেতে পারে।

সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও অস্ত্র

প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যেই সমস্ত মেহনতির যেমন তেমনি ভবিষ্যৎ স্বার্থের বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশের জনগণের ক্ষেত্রে তা সমাজতন্ত্র নির্মাণ ও সম্পূর্ণীকরণে কম মুশকিল ঘটাচ্ছে না। পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে অস্ত্র প্রতিযোগিতা আর সামরিক মনোবিকারের পরিণামে নেমে যাচ্ছে মেহনতিদের জীবনযাত্রার মান, শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, শক্তিশালী হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার অবস্থান, তার ফলে দুর্বল হচ্ছে সাচ্চা গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রাম। সদ্যোমুক্ত দেশের মেহনতিদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি, অস্ত্র প্রতিযোগিতায় তাদের টেনে আনায় তাদের নিঃস্বতা ও পশ্চাৎপদতা বজায় থাকে, সাম্রাজ্যবাদের কাছে তাদের অধীনতা বৃদ্ধি পায়, এসব দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ আটকা পড়ে। ন্যায্য ও মানবিক সমাজ গড়ার জন্য বিশ্বের সমস্ত দেশের মেহনতিদের অবজেকটিভ আগ্রহশীলতা তাদের করে তোলে জাতিতে জাতিতে শান্তির প্রবল প্রবক্তা, আগ্রাসী যুদ্ধ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার প্রতিপক্ষ।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি, পৃথিবীতে পাকাপোক্ত শান্তির জন্য সংগ্রাম বলতে বোঝায় যেকোনো জাতির বিরুদ্ধে আগ্রাসনে সুদৃঢ় প্রতিঘাত। বৈদেশিক প্রভুত্ব বা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রামী জনগণকে সমর্থন ও সাহায্যের নীতিতে শান্তিকামী শক্তিরা হয় প্রবল আর সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল। বৈদেশিক

প্রভু আর হস্তক্ষেপকারীদের বিতাড়নের জন্য মুক্তি সংগ্রাম চালাবার পবিত্র অধিকার আছে প্রত্যেকটি জাতিরই। সমাজতান্ত্রিক দেশেরা দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় সংগ্রামী জনগণের পক্ষে, সর্বোপায়ে তাদের সাহায্য ও সমর্থন করে এবং করে যাবে।

এইসব কর্তব্য সম্পাদনে শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি হল বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে শ্রেণী সংগ্রাম, বৈপ্লবিক মুক্তি সংগ্রামের একটা বিশিষ্ট আত্মপ্রকাশ ও রূপ। বিশ্ব পরিসরে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের গোটা ঐতিহাসিক পর্বে এ সংগ্রাম তার তাৎপর্য অক্ষুণ্ণ রাখে।

সমাজতান্ত্রিক দেশেরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যে নীতি অনুসরণ করে তার ভূমিকা ও তাৎপর্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার পক্ষ থেকে অন্যান্য দেশে প্রতিবিপ্লব রপ্তানি ও হস্তক্ষেপের সুযোগ নাকচ করে দিয়ে পুঁজিতান্ত্রিক দেশের অভ্যন্তরে মেহনতিদের শ্রেণী সংগ্রাম এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিকাশের অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে তোলাই তার কাজ।

শ্রেণী সংগ্রামের সর্বোচ্চ পর্যায় হিশেবে বিপ্লব হল প্রতিটি সমাজের অভ্যন্তরীণ বিকাশের পরিণাম, পরের দেশে ফরমাশ দিয়ে, চুক্তি করে তা ঘটানো যায় না। সেই সঙ্গে, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় যা দেখা যাচ্ছে, একসারি দেশে বিপ্লবের জয়লাভের পথে প্রধান বাধা হল আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার হস্তক্ষেপ। অন্য দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি কঠোরভাবে অনুসৃত

হলে প্রতিবিপ্লব রপ্তানি বন্ধ হয়, আর তাতে করে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর মুক্তি সংগ্রামের অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে ওঠে।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে দেখে আন্তর্জাতিক মঞ্চে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভাবাদর্শীয় ক্ষেত্রে বিকাশমান শ্রেণী সংগ্রামের রূপ বলে।

নতুন বিশ্ব যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক, জাতীয় মুক্তি, সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রবাহিনী হিশেবে এগিয়ে এসে কমিউনিস্টরা সারা দুনিয়ায় সমাজতন্ত্রের জয়লাভের পথ পাতে।

এ প্রসঙ্গে সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে শান্তি আপনা থেকে আসে না, শান্তি অর্জিত হয় না কেবল শুভেচ্ছা থাকলেই। শান্তির জন্য লড়তে হয়। মানবজাতির সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির সংগ্রামেই কেবল শান্তি রক্ষিত ও সংহত হতে পারে। সেটা সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে পোল্যান্ডের সাহিত্যিক ও কবি ইয়ারোস্লাভ ইভাশকেভিচের 'শান্তি' নামক কবিতায়:

নয়কো সে নীলাকাশে শশী কবুতর,
সুমধুর স্বপনেতে ক্লান্তি,
বিজলী বিভায় অবশেষে মনোহর
পৃথিবীর বুকে সেই শান্তি।

নয় কোনো বীণাতারে অলস রণন,
কুসুমের কোরকের কান্তি,

নয় মধুমাসে বারিধারা বরিষণ
পৃথিবীর বুকে সেই শান্তি।

সাধারণ শপথের প্রতি একনিষ্ঠা
জানে না যা ভ্রান্তি বা ক্লান্তি,
সাধারণ সংগ্রামে পাবে যা প্রতিষ্ঠা
পৃথিবীর বুকে সেই শান্তি।

হাত মুঠো করে তার পূজারীরা যবে
জনে জনে ডাক দেবে, ক্ষান্তি
জানবে না ভ্রাতৃমহোৎসবে, তবে
ধরার ধর্ম হবে শান্তি।

ব্যবহৃত পরিভাষার অর্থ

অবজেকটিভ — ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা বহির্ভূত, স্বাধীন।

অবজেকটিভ বাস্তবতা — প্রকৃতি, সমাজ, মানুষের পারিপার্শ্বিক জগৎ — তেমন সবকিছু যা মানুষের চেতনা নিরপেক্ষে বাস্তবে বিদ্যমান।

অলিগার্কি, গোষ্ঠীতন্ত্র — অল্প কয়েকজনের ক্ষমতা, শোষক রাষ্ট্র শাসনের একটি রূপ, যাতে গোটা রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকে মুষ্টিমেয় ধনীদের হাতে। সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতিতে ফিনান্স গোষ্ঠীতন্ত্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজেদের অধীনে রাখে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি স্থির করে দেয়, নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব খাটায় অত্যধিকাংশ জনগণের ওপর।

আমলাতন্ত্র — জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের উপরিস্থিত, বিশেষ বিশেষ কাজ চালাবার ভারপ্রাপ্ত ও সুবিধাভোগী একটা যন্ত্র দ্বারা প্রশাসন চালাবার ব্যবস্থা এবং লোকেদের তৎসংশ্লিষ্ট স্তর। শ্রেণী উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে দাসতান্ত্রিক সমাজেই আমলাতন্ত্র দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের পরিস্থিতিতে তা বিপুল আকার ধারণ করে। আমলাতন্ত্রের ধর্ম হল বাহ্যিক অনুষ্ঠানসর্বস্বতা, নিষ্প্রাণতা, ছলচাতুরী। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বুর্জোয়া আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে দেয় আর সমাজতন্ত্র নির্মাণে গড়ে ওঠে সমস্ত রূপের আমলাতন্ত্রকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করার পূর্বশর্ত।

একচেটিয়া — ১) কোনো কিছুতে, যেমন একটা বস্তুর উৎপাদনে, নির্দিষ্ট কোনো পণ্যের ব্যবসায়ে, বহির্বাণিজ্যে অবিভাজ্য অধিকার; ২) পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়া (কার্টেল, কনসার্ণ, সিণ্ডিকেট, ট্রাস্ট, কর্পোরেশন) — উৎপাদন ও পুঁজির অতি উচ্চ মাত্রার কেন্দ্রীভবনের ভিত্তিতে পুঁজিপতিদের জোট, সংঘ, চুক্তি। বড়ো বড়ো একচেটিয়া এক বা কতকগুলি শাখার উৎপাদন ও বিক্রয়ের বড়ো একটা অংশ, শিল্প ও বাণিজ্যে অর্থযোজনা নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করে।

একনায়কত্ব — কোনো একটা শ্রেণীর রাজনৈতিক

প্রভুত্ব : আইনের পরোয়া না করে বলপ্রয়োগে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী এক ব্যক্তির রাষ্ট্র শাসন।

কর্পোরেশন — ব্যক্তিমালিকি গ্রুপ স্বার্থের ভিত্তিতে সংকীর্ণ, রুদ্ধদ্বার সংঘ, জোট।

কোআলিশন — সাধারণ রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধিক রাষ্ট্র, রাজনৈতিক পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য সংগঠনের ঐক্য, জোট, সম্মতি।

জাতীয়করণ — ভূমি, শিল্প, পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাংক ইত্যাদির স্বত্ব ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ে রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর।

জাতীয়তাবাদ — জাতিতে জাতিতে সম্পর্কের প্রশ্নে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ, রাজনীতি, মনোবৃত্তি। জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য হল প্রকৃতিগতভাবেই অন্যান্য 'নিম্ন', 'হীন' জাতির তুলনায় একদল 'উচ্চ', 'নির্বাচিত' জাতির ধারণা। জাতীয়তাবাদ দেখা দেয় পুঁজিতন্ত্রের উদয় ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। সাম্রাজ্যবাদের পর্বে একচেটিয়া বুর্জোয়ার জাতীয়তাবাদ একটা প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শ, জাতীয়-ঔপনিবেশিক পীড়ন ও শোষণের রাজনীতি। অন্যদিকে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের

জনগণের মুক্তি সংগ্রামে নিপীড়িত দেশের জাতীয়তাবাদে ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রগতিশীল সাধারণ গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উপাদান থাকে। তবে নিপীড়িত জাতির জাতীয়তাবাদেও প্রতিক্রিয়াশীল শোষক ওপরতলার স্বার্থ ও ভাবাদর্শ প্রকাশের মতো দিকও থাকে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে জাতীয়তাবাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি থাকে না।

ট্রেড ইউনিয়ন — উৎপাদনে, সার্বিস ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিতে নিজেদের কাজকর্মের প্রকৃতিবশে সাধারণ স্বার্থে জড়িত মেহনতিদের গণ সংগঠন। তার কাজ মেহনতিদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা।

ডিভিডেণ্ট — শেয়ারধারীদের মধ্যে বণ্টনের জন্য কোম্পানির লভ্যাংশ।

নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিকেলিজম — শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদী ধারা যাতে মনে করা হয় সিণ্ডিকেট (ট্রেড ইউনিয়ন) শ্রমিক শ্রেণী সংগঠনের সর্বোচ্চ রূপ, শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের রাজনৈতিক রূপ এবং তাতে মার্কসবাদী পার্টির নেতৃভূমিকার তারা বিরোধী। এর উদ্ভব উনিশ শতকের শেষ দিকে, ছড়ায় প্রধানত ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে। কমিউনিস্ট ও

শ্রমিক পার্টিগুলির প্রভাব বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের জোয়ারে নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিকেলিজমের প্রতিপত্তি প্রচণ্ড খোয়া যায়।

পুনঃপ্রতিষ্ঠা (রাজনৈতিক) — বিপ্লবে উৎখাত সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা পূর্বতন রাজবংশের পুনরাগমন।

প্রতিক্রিয়া (রাজনৈতিক) — সামাজিক প্রগতি, বৈপ্লবিক, গণতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে প্রতিরোধ; পুরনো, অচল হয়ে পড়া আমল রক্ষা ও প্রবল করার জন্য স্থাপিত রাজনৈতিক আমল। চরম রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার একটি রূপ হল ফ্যাসিজম। প্রতিক্রিয়াশীল — রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া, প্রতিবিপ্লবের পক্ষপাতী, তদুদ্দেশ্যে চালিত।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ভিত্তি হল মেহনতিদের অপ্রলেতারীয় স্তরের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের জোট। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব একটা ঐতিহাসিক নিয়ম, পুঁজিতন্ত্র এবং সেই সঙ্গে মানুষ কর্তৃক মানুষের সর্ববিধ শোষণ, সমস্ত রূপের সামাজিক ও জাতীয় পীড়নের উচ্ছেদ এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য তা আবশ্যক।

বর্ণবাদ — মানববিদ্বেষী বিজ্ঞানবিরোধী তত্ত্ব ও প্রতিক্রিয়াশীল পলিসি, তার ভিত্তিতে থাকে এই মিথ্যা মত যে বিভিন্ন race বা অধিজাতি জৈবিক ও মানসিক দিক থেকে অসমান।

ভাবাদর্শ — রাজনৈতিক, আইনী, নৈতিক, দার্শনিক, ধর্মীয়, শিল্পীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যানধারণার তন্ত্র: তার চরিত্র শ্রেণীগত। বৈরগর্ভ ব্যবস্থায় প্রাধান্য করে শাসক শ্রেণীর ভাবাদর্শ, তার বিপরীতে দাঁড়ায় শোষিত শ্রেণীর ভাবাদর্শ। সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার ভাবাদর্শীরা তাদের ভাবাদর্শের শ্রেণী চরিত্র লুকিয়ে রাখতে, অন্য ভেক ধরাতে, তাকে শ্রেণী-ঊর্ধ্ব, নির্দলীয় বলে চালাতে চেষ্টা করে। এই ধরনের কথার অসিদ্ধি খুলে দেখায় মার্কসবাদ প্রমাণ করে যে শ্রেণী সমাজে 'পার্টিবহির্ভূত' ভাবাদর্শ থাকা অসম্ভব। ভাবাদর্শ সামাজিক সম্পর্কের প্রতিফলন, নিজেও আবার তা প্রভাবিত করে সমাজজীবনকে। বিশ্ব বিকাশের বর্তমান পর্যায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভাবাদর্শীয় সংগ্রামের তীব্রতায় চিহ্নিত।

ফ্যাসিজম — সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার সবচেয়ে আগ্রাসী মহলের স্বার্থপ্রকাশক সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক ধারা; একচেটিয়া পুঁজির খোলাখুলি সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্ব। ফ্যাসিজম, ফ্যাসিস্টদের বৈশিষ্ট্য হল চরম শোভিনিজিম, বর্ণবাদ,

কমিউনিজমবিরোধিতা, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা হরণ, পররাজ্যগ্রাসী যুদ্ধ।

বহুজাতিক কর্পোরেশন — বর্তমান পুঁজিতন্ত্রে আন্তর্জাতিক একচেটিয়ার সর্বাধিক প্রচলিত রূপ। শেয়ার পুঁজির মূল ভাগটার দিক থেকে এগুলি একদেশীয়, কিন্তু ক্রিয়াকলাপের দিক থেকে বহুদেশীয়। এগুলির উদ্ভবের মূলে আছে উৎপাদন ও পুঁজির পুঞ্জীভবন ও কেন্দ্রীভবন।

মালিকানা — বৈষয়িক সম্পদ, সর্বাগ্রে উৎপাদনের উপায় দখল করার ইতিহাস-নির্দিষ্ট সামাজিক রূপ। ৫ ধরনের মালিকানার কথা জানা আছে: আদিম-গোষ্ঠীগত (কৌলিক), দাসতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক। শোষক, শ্রেণীবৈরমূল সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে থাকে ব্যক্তিগত মালিকানা।

মুনাফা (পুঁজিতান্ত্রিক) — আয়ের যে অংশটা পুঁজিপতি বিনামূল্যে আত্মসাৎ করে। মুনাফা আসে পুঁজি কর্তৃক শ্রমিকদের শ্রম শোষণের ফলে। পুঁজিপতিদের মুনাফা লিপ্সাই হল পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র — একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের আধুনিক রূপ, তার মূলকথা হল একচেটিয়া পুঁজির ক্রমবর্ধমান মুনাফা নিশ্চিত করা

এবং শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন, নিপীড়িত জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম দমন করার জন্য রাষ্ট্রের শক্তি আর একচেটিয়ার শক্তির মিলন।

শেয়ার — পুঁজিতান্ত্রিক দেশে শেয়ার কোম্পানিগুলি কর্তৃক প্রদত্ত সিকিউরিটি পত্র, কোম্পানির মূলধনে এ পত্রের অধিকারীর অংশের শংসাপত্র, যার বলে কোম্পানির লাভে ভাগ পাওয়া, ডিভিডেন্ড পাবার অধিকার বর্তায়।

শেয়ার কোম্পানি — পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগের একটা রূপ, যাতে পুঁজি গড়ে ওঠে অনেকের চাঁদায়, যার জন্যে চাঁদাদাতাকে তার প্রদত্ত অর্থ অনুসারে বার্ষিক মুনাফার ভাগ বা ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়।

শোভিনিজম — চরম জাতিবাদ, জাতীয় ঐকান্তিকতা, অন্য জাতির চেয়ে একটা জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার, অন্য সমস্ত জাতির স্বার্থের বিপরীতে একটা জাতির স্বার্থকে তুলে ধরা, জাতীয় শত্রুতা উশকানো, অন্যান্য জাতি ও অধিজাতির প্রতি বিদ্বেষ।

শোধনবাদ — শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী সুবিধাবাদী ধারা, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষামালার সংশোধনে, পুনর্বিচারে যা চেষ্টিত। বৈরগর্ভ সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের অনিবার্যতা, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, এবং পুঁজিতন্ত্র থেকে

সমাজতন্ত্র উত্তরণের পর্বে শ্রমিক শ্রেণীর প্রভুত্বের রূপ হিশেবে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের বৈজ্ঞানিক প্রতিপাদ্যে আপত্তি করে শোধনবাদীরা।

শোষণ — দাসতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক এই শোষক সমাজগুলির যা প্রকৃতিগত — উৎপাদনী উপায়ের মালিক শ্রেণী কর্তৃক অপরের শ্রমফল আত্মসাৎ। শোষক শ্রেণীগুলি (দাসমালিক, সামন্ত, পুঁজিপতি) কর্তৃক মেহনতি শ্রেণীদের পীড়ন। কেবল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় এবং উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদেই চিরকালের জন্য মানুষ কর্তৃক মানুষের সর্ববিধ শোষণের উচ্ছেদ হয়।

সংস্কারবাদ — শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদবিরোধী সুবিধাবাদী ধারা যা বৈপ্লবিক শ্রেণী সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বে আপত্তি করে। পুঁজিতন্ত্রের পচনশীল বনিয়াদকে না টলিয়ে ছোটোখাটো সংস্কারের নীতিতে সীমিত থাকে সংস্কারবাদীরা।

সভ্যতা — সামাজিক বিকাশের নির্দিষ্ট একটি পর্যায়ে অর্জিত বৈষয়িক ও মানসিক সংস্কৃতি বিকাশের মান, যেমন প্রাচীন সভ্যতা, আধুনিক সভ্যতা। অনেক সময় সভ্যতা বলতে কেবল বর্তমান কালে মানবজাতির সংস্কৃতি ও টেকনিকের মান বোঝায়।

সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসি — উনিশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে উদিত ধারা। প্রথম দিকে তা বৈপ্লবিক, মার্কসবাদী অবস্থান নেয়, সমাজতন্ত্রের প্রচার করে। মোটামুটি উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে পশ্চিমের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলি ক্রমেই সুবিধাবাদী ও সংস্কারবাদের দিকে ঝুঁকতে থাকে।

9th OCTOBER 2015

CALCUTTA

BENGAL

the INDIAN SUBCONTINENT

@ ₹ 15.50

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ-আ-ক-খ

গ্রন্থমালায় আছে এই বিষয়ে বইগুলি:

সমাজবিদ্যার পাঠ-সংকলন

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ

অর্থশাস্ত্র কী

দর্শন কী

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কী

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী?

পুঁজিতন্ত্র কী

সমাজতন্ত্রে কী বোঝায়

কমিউনিজম কী

শ্রম কী

উদ্বৃত্ত-মূল্য কী

সম্পত্তি-মালিকানা কী

শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম

পার্টি কী

রাষ্ট্র কী

ট্রেড ইউনিয়ন কী

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব কী

বিপ্লব কী

মেহনতি মানুষের ক্ষমতা কী

ISBN 5-01-000816-5